বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

কামিল (স্নাতকোত্তর) তাফসীর ১ম পর্ব

৬ষ্ঠ পত্র : আত-তারিখুল ইসলামী ও তারিখু ইলমিত তাফসির

বিষয় কোড: ৬২১১০৬

নির্ধারিত গ্রন্থ:

(১) নবী জীবনী: ঘটনাবলীর উপস্থাপন ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ- **ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী**

(د. علي محمد الصلابي : السيرة النبوية : عرض وقائع وتحليل أحداث)

(২) খলীফাদের ইতিহাস- সুয়ূতী

(السيوطي: تاريخ الخلفاء)

(৩) তাফসীর ও মুফাসসিরগণ- ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী:

(الدكتور محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون)

নির্ধারিত পাঠ: সাজেশন অংশে

▪ মানবন্টন

- **ক) আত-তারিখুল ইসলামী: ৬০**
  - নবী (ছাঃ) জীবনী ২টি থেকে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১৫=১৫
  - খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ২টি থেকে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১৫=১৫
  - উমাইয়া যুগ ২টি থেকে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১৫=১৫
  - আব্বাসী যুগ ২টি থেকে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১৫=১৫
- **খ) তারিখু ইলমিত তাফসির: ৪০**
  - বিস্তারিত প্রশ্নোত্তর ৪টি থেকে ২টির উত্তর দিতে হবে: ২×১৫=৩০
  - সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ৪টি থেকে ২টির উত্তর দিতে হবে: ২×৫=১০

▪ স্পেশাল সাজেশন

(ক. ইসলামী ইতিহাস)

أ- ما هي الايام الجاهلية؟ بين الاحوال الاجتماعية والدينية قبل ميلاد التي صلى الله عليه وسلم.

জাহেলিয়াতের যুগ কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর।

ب- اكتب اسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واهميتها في التاريخ الإسلامي

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের কারণসমূহ এবং ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব লিখ।

ج- ما معنى المعراج؟ وهل كان في المنام ام فى اليقظة بين عن الفضائل التي تحلى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج

মি'রাজ অর্থ কী? এটি কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগরণে? মি'রাজের রাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন তা বর্ণনা কর।

د- عرف ميثاق المدينة. ثم بين اهميته في التاريخ الإسلامي

মদীনার সনদ (মীসাকুল মদীনা)-এর সংজ্ঞা দিন। অতঃপর ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(খ. ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস)

أ. ما معنى التفسير وما الفرق بين التفسير والتأويل؟ وما المراد بالتفسير بالماثورة بين مفصلا

তাফসীর অর্থ কী? তাফসীর ও তা'বীল-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এবং তাফসীর বিল মাছূর (বর্ণনানির্ভর তাফসীর) বলতে কী বোঝায়? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

ب. ما العلوم التي يحتاج اليها المفسر في تفسير القرآن بين مفصلا

কুরআন তাফসীরের জন্য একজন মুফাসসিরের (ভাষ্যকারের) কী কী জ্ঞানের শাখা প্রয়োজন? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

ج. على وكيف بدأ تدوين التفسير؟ اكتب مفصلا

কখন এবং কিভাবে তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল? বিস্তারিতভাবে লিখ।

د. من الذين اشتهروا في التفسير من الصحابة ؟ بين مزايا التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারা তাফসীরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

مجموعة (ج)- ١٠

٣- علق على اثنين من الموضوعات التالية: ١٠

(নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে যেকোনো দু'টির উপর টীকা লিখ।)

أ. ما الفرق بين التفسير والترجمة؟ بين.

তাফসীর ও তরজমার (অনুবাদ) মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর।

ب. من هو رئيس المفسرين؟ اذكر خدماته في التفسير.

প্রধান মুফাসসির কে? তাফসীরের ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখ কর।

ج. اكتب أهمية التفسير في الحياة الانسانية.

মানব জীবনে তাফসীরের গুরুত্ব লিখ।

د. اكتب خصائص تفسير القرآن العظيم.

তাফসীরুল কুরআনিল আযীমের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

▪ বিস্তৃত সাজেশন

(ক) নবী জীবনী: ঘটনাবলীর উপস্থাপন ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ -ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী (د. علي محمد الصلابي : السيرة النبوية : عرض وقائع وتحليل أحداث)

(খ) তাফসীর ও মুফাসসিরগণ- ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (الدكتور محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون)

(ক) ইসলামী ইতিহাস (التاريخ الإسلامي)

- **নবী জীবনী** (السيرة النبوية)
  - নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে আরবদের অবস্থা: সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পরিস্থিতি (أحوال العرب قبل مبعث النبي الحالات الاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية والأخلاقية)
  - নবী (ﷺ)-এর মক্কী জীবন (الحياة المكية للنبي (ﷺ))
  - মাদানী জীবন (الحياة المدنية)
  - যুদ্ধ, ছোট অভিযান ও বিজয়সমূহ (الغزوات والسرايا والفتوحات)
- **খলীফাদের ইতিহাস-সুয়ূতী** (السيوطي: تاريخ الخلفاء)

*খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)-(عهد الخلفاء الراشدين (٦٣٢-٦٦١)

* উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-(الدولة الأموية (٧٥٠-٦٦١)

* আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-(الدولة العباسية (٧٥٠-١٢٥٠)

(খ) ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস (তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস)

১. التفسير والتأويل : تعريفهما وموضوعهما وغرضهما وفوائدهما

তাফসীর ও তা'বীল: উভয়ের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

২. نشأة التفسير والتأويل وتطورهما.

তাফসীর ও তা'বীল-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

৩. التفسير في العهد النبوي وفي عهد الصحابة والتابعين ومنهجه

নবী যুগে, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীর এবং এর পদ্ধতি

৪. مصادر التفسير في العهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين.

নবী যুগ, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের উৎসসমূহ

৫. مدارس التفسير في عهدي الصحابة والتابعين

সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের বিভিন্ন ধারা

৬. أشهر المفسرين في الصحابة والتابعين تراجمهم.

সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী

৭. تاريخ تدوين التفسير.

তাফসীর লিপিবদ্ধ করার ইতিহাস

৮. طبقات المفسرين ومراتب التفسير.

মুফাসসিরগণের স্তর ও তাফসীরের পর্যায়

৯. أشهر المفسرين من المتأخرين وتراجمهم ومناهجهم في المؤلفات التفسيرية

পরবর্তী যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী ও তাফসীর গ্রন্থাবলীতে তাঁদের পদ্ধতি

১০. أنواع التفسير (التفسير بالرواية والتفسير بالدراية)

তাফসীরের প্রকারভেদ (রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর ও জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর)

১১. أشهر التفاسير لأهل السنة وغيرهم من الشيعة والخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم

আহলে সুন্নাহ ও অন্যান্য যেমন শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা, ইবাদিয়া প্রমুখদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ

১২. تاريخ التفسير بغير اللغة العربية (الفارسية والأردية والبنغالية) نشأته وتطوره

আরবি ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস (ফার্সি, উর্দু ও বাংলা): এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৩. علم أصول التفسير : تعريفه ونشأته وتطوره عبر العصور

ইলমে উসূলুত তাফসীর (তাফসীরের নীতিমালা): এর সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও শতাব্দীর পরিক্রমায় এর বিকাশ

১৪. ترجمة القرآن : تعريفه وأقسامه وحكمه و نشأته وتطوره

কুরআনের অনুবাদ: এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিধান এবং উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

এখান থেকে উত্তর শুরু

(ক. ইসলামী ইতিহাস)

١- ما هي الايام الجاهلية؟ بين الاحوال الاجتماعية والدينية قبل ميلاد التي صلى الله عليه وسلم.

জাহেলিয়াতের যুগ কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর।

জাহেলিয়াতের যুগ হলো আরব উপদ্বীপে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বের সময়কাল, বিশেষ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির আগের যুগ। এই যুগকে জাহেলিয়াত (অজ্ঞতা) নামে অভিহিত করা হয় কারণ এই সময়ে সঠিক দ্বীনের অভাব ছিল এবং আসমানী শরীয়ত ও উত্তম নৈতিকতার বিরোধী রীতিনীতি ও প্রথা প্রচলিত ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার সামাজিক অবস্থা:

- গোত্রবাদ ও গোত্রীয় বিদ্বেষ: ইসলামপূর্ব আরব সমাজ ছিল গোত্রভিত্তিক, যেখানে গোত্রই ছিল সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। গোত্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক গোত্রীয় বিদ্বেষের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত ছিল, অর্থাৎ নিজ গোত্রের প্রতি অন্ধ সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব ছিল প্রবল। এর ফলে সামান্য কারণেও গোত্রগুলোর মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ ও সংঘাত লেগেই থাকত।
- শ্রেণী বৈষম্য: সমাজে সুস্পষ্ট শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য সর্দার ও অভিজাত শ্রেণী ছিল, যারা ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী ছিল, অন্যদিকে দুর্বল ও দাস শ্রেণী শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হতো।
- নারীর মর্যাদা: জাহেলী সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল অত্যন্ত নিম্ন। তাদের পণ্য বা সহায়-সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তাদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। তারা অপমান ও অত্যাচারের শিকার হতো এবং কন্যা সন্তানদের অপমানের বা দারিদ্র্যের ভয়ে জীবন্ত কবর দেওয়া (ওয়া'দুল বানাত) একটি সাধারণ প্রথা ছিল।
- মন্দ রীতিনীতি: জাহেলী সমাজে মদ্যপান, জুয়া খেলা, ব্যভিচার, লুটপাট ও গোত্রগুলোর মধ্যে হামলা-সংঘর্ষের মতো বহু মন্দ রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। বংশ ও আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করাও সাধারণ ব্যাপার ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার ধর্মীয় অবস্থা:

- শিরক ও মূর্তি পূজা: শিরক ছিল আরব উপদ্বীপের প্রধান ধর্ম। আরবরা বহু মূর্তি ও প্রতিমার পূজা করত, যা তারা নিজেরাই তৈরি করত এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করত। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব বিশেষ মূর্তি ছিল এবং কাবা শরীফ মূর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।
- ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধর্মের কিছু অবশিষ্ট: শিরক ব্যাপক হলেও, নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধর্মের কিছু রীতিনীতি তখনও বিদ্যমান ছিল, যেমন কাবার সম্মান, হজ ও উমরাহ এবং খৎনা। তবে এই আচারগুলো শিরক ও কুসংস্কারে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

- ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্ম: আরব উপদ্বীপের কিছু অংশে, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বসতি ছিল। তবে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন ও বিকৃত করেছিল এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ ও বিদ'আত (ধর্মীয় উদ্ভাবন) প্রচলিত ছিল।
- জ্যোতিষ, ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যৎবাণী: জ্যোতিষ, ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যৎবাণী প্রচলিত ছিল। মানুষ ভবিষ্যৎ জানার ও প্রয়োজন পূরণের জন্য জ্যোতিষী, গণক ও ভবিষ্যৎ বক্তাদের কাছে যেত, যা তাওহীদ (একত্ববাদ) থেকে দূরে সরে যাওয়ার লক্ষণ।
- আসমানী শরীয়তের অনুপস্থিতি: মানুষের জীবনের জন্য কোনো প্রভাবশালী ও সুসংগঠিত আসমানী শরীয়ত ছিল না। গোত্রীয় আইন ও প্রথাই প্রচলিত ছিল এবং সেগুলো প্রায়শই অবিচার ও খেয়ালখুশির উপর ভিত্তি করত।

সংক্ষেপে, জাহেলিয়াতের যুগ ছিল ধর্মীয় ও নৈতিক অজ্ঞতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অবিচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ একটি সময়কাল। তাই আরব সমাজ ইসলামের নূরের জন্য অত্যন্ত মুখাপেক্ষী ছিল, যা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার জন্য।

٢- اكتب اسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واهميتها في التاريخ الإسلامي

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের কারণসমূহ এবং ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব লিখ।

অবশ্যই, পূর্বের মতো বাংলায় উত্তর দিচ্ছি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের কারণসমূহ:

১. কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর অত্যাচারের তীব্রতা: মক্কা মুকাররমায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির পর, কুরাইশরা তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন এবং দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা আরও বাড়িয়ে দেয়। মুসলিমরা মক্কায় স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারছিলেন না।

২. আবু তালিব ও হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মৃত্যু: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে হারান, যিনি মক্কায় তাঁকে রক্ষা করতেন ও সমর্থন দিতেন। এছাড়াও তিনি হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হারান, যিনি ছিলেন শক্তিশালী ও সাহসী মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম। এই দুই ব্যক্তির মৃত্যু মুসলিমদের অবস্থান দুর্বল করে এবং কুরাইশদের সাহস আরও বাড়িয়ে তোলে।

৩. মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও দাওয়াতের পরও মক্কায় কুরাইশদের সাড়া ছিল দুর্বল এবং তাদের প্রতিরোধ ছিল তীব্র। এই পরিস্থিতিতে মক্কায় ইসলামের ব্যাপক প্রসারের আর তেমন আশা ছিল না।

৪. প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার শপথ: ইয়াসরিবের (মদীনা মুনাওয়ারা) লোকেরা ইসলামের ডাকে সাড়া দেয় এবং আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার এবং তাদের শহরে ইসলাম প্রচারের অঙ্গীকার করে। মদীনা মুনাওয়ারা মুসলিমদের গ্রহণের জন্য একটি নিরাপদ ও প্রস্তুত পরিবেশে পরিণত হয়।

৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের স্বপ্ন: কিছু বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে খেজুর বাগানসমৃদ্ধ দুটি পাথুরে ভূমির মধ্যবর্তী একটি ভূমি দেখেন, যা তিনি ইয়াসরিব হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

৬. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ: উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার অনুমতি দেন।

ইসলামী ইতিহাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের গুরুত্ব:

১. ইসলামের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা: হিজরত ইসলামী ইতিহাসে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করে। মক্কায় ইসলাম যখন সীমাবদ্ধ ও নিপীড়িত ছিল, তখন মদীনা মুনাওয়ারায় তা প্রচার ও প্রসারের জন্য উর্বর ভূমি খুঁজে পায়।

২. প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা: মদীনা মুনাওয়ারায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য একটি সংবিধান (মদীনা সনদ) প্রণয়ন করেন, যা মুসলিম ও অন্যান্য বাসিন্দাদের মধ্যে সম্পর্ককে সুসংগঠিত করে।

৩. ইসলামী সমাজের গঠন: হিজরত একটি সুসংহত ও শক্তিশালী ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়ক হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির (হিজরতকারী) ও আনসার (সাহায্যকারী)-দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন এবং মুসলিমরা ইসলামের পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হন।

৪. ইসলামী বিজয়ের সূচনা: মদীনা মুনাওয়ারা ছিল ইসলামী বিজয়ের সূচনার কেন্দ্র, যার মাধ্যমে ইসলামের বার্তা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

৫. ইতিহাসের গতি পরিবর্তন: হিজরত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে এবং একটি মহান ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেয়, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল।

৬. হিজরী সন প্রবর্তন: মুসলিমরা হিজরতের বছরকে হিজরী ক্যালেন্ডারের শুরু হিসেবে গ্রহণ করে, যা তাদের ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্বের পরিচায়ক।

৭. ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার আদর্শ: হিজরত মুহাজিরদের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার এবং আনসারদের তাদের ভাইদের স্বাগত জানানো, আশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য করার মহান মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক।

সংক্ষেপে, মক্কা থেকে মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ছিল একটি মহান ঘটনা, যা ইসলাম ও সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। এটি ছিল ইসলামী দাওয়াতের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক এবং ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থানের একটি বেদনাদায়ক মুহূর্ত।

٣- ما معنى المعراج؟ وهل كان في المنام ام فى اليقظة بين عن الفضائل التي تحلى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج

মি'রাজ অর্থ কী? এটি কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগরণে? মি'রাজের রাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন তা বর্ণনা কর।

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর "নবী জীবনী" গ্রন্থে মি'রাজের অর্থ, এর বাস্তবতা (স্বপ্নে নাকি জাগরণে) এবং মি'রাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্জিত গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের আলোকে উত্তরগুলো নিম্নরূপ:

মি'রাজের অর্থ:

ড. সাল্লাবী ভাষাগতভাবে "মি'রাজ" শব্দের অর্থ ঊর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইসলামী পরিভাষায়, মি'রাজ হলো সেই অলৌকিক ভ্রমণ যা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে ও আত্মায় মক্কার হারাম শরীফ থেকে জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদে আকসা) পর্যন্ত এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে (সাত আসমান) আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। এই রাতে তিনি আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান লাভ করেছিলেন।

এটি কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগরণে:

ড. সাল্লাবী এই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলেম এবং সাহাবা ও তাবেঈনদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে মি'রাজ জাগরণে, আত্মা ও শরীর উভয়ভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি এর সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন:

- কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা (ظاهر النصوص القرآنية والحديثية): মি'রাজ সম্পর্কিত আয়াত (যেমন সূরা আল-ইসরা) এবং সহীহ হাদীসগুলোতে এই ভ্রমণের বিস্তারিত শারীরিক ও জাগতিক বিবরণ রয়েছে, যা কেবল স্বপ্ন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।
- ঘটনার অসাধারণত্ব (عظمة الحدث): ড. সাল্লাবী মনে করেন যে মি'রাজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ ঘটনা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন একটি বিশেষ অনুগ্রহ কেবল স্বপ্নে হতে পারে না।
- আল্লাহর অসীম ক্ষমতা (قدرة الله تعالى المطلقة): তিনি উল্লেখ করেন যে আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং তাঁর নবীর শরীর ও আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।
- কাফেরদের তীব্র বিরোধিতা (إنكار الكفار الشديد): ড. সাল্লাবী বলেন যে মক্কার কাফেররা মি'রাজের ঘটনাকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছিল, যা প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলেছিলেন যা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। যদি এটি কেবল স্বপ্ন হতো, তবে তারা সম্ভবত এত বিরোধিতা করত না।

মি'রাজের রাতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন:

ড. সাল্লাবী মি'রাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন মহৎ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- মনোনীত ও নির্বাচিত (الاختيار والاصطفاء): আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ ও সম্মানিত সফরের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনোনীত করেছিলেন, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয় হওয়ার প্রমাণ।

- আল্লাহর নৈকট্য লাভ (القرب من الله تعالى): নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সান্নিধ্যে পৌঁছেছিলেন যেখানে অন্য কোনো মানুষ পৌঁছাতে পারেনি এবং সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সম্মান লাভ করেছিলেন।
- আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলী দর্শন (رؤية آيات الله الكبرى): তিনি ঊর্ধ্বলোক ও পৃথিবীতে আল্লাহর অসংখ্য বিস্ময়কর নিদর্শন দেখেছিলেন, যা তাঁর জ্ঞান, বিশ্বাস ও দৃঢ়তাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল।
- নবীদের ইমামতি (الإمامة بالأنبياء): বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি অন্যান্য সকল নবীদের (আঃ) ইমাম হিসেবে সালাত আদায় করেছিলেন, যা তাঁর নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রতীক।
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত লাভ (فرض الصلوات الخمس): এই রাতে উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সরাসরি নাযিল হয়, যা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান অনুগ্রহের মাধ্যম ছিলেন।
- ধৈর্য ও দৃঢ়তা (الصبر والثبات): মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর কুরাইশদের অবিশ্বাস ও উপহাসের সম্মুখীন হয়েও তিনি সত্যের উপর অবিচল ছিলেন এবং যা দেখেছিলেন তা সাহসের সাথে প্রচার করেছিলেন।
- অগাধ বিশ্বাস ও ঈমান (اليقين والإيمان العميق): এই অসাধারণ সফরের পর আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ঈমান আরও গভীর ও দৃঢ় হয়েছিল।
- উম্মতের প্রতি দয়া ও করুণা (الرحمة والرأفة بالأمة): পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বিধানের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর কাছে উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, যার ফলে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয় এবং পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব বহাল থাকে। এটি তাঁর উম্মতের প্রতি গভীর দয়া ও করুণার পরিচয় দেয়।

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর গ্রন্থে মি'রাজের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমান্বিত গুণাবলী অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

٤- عرف ميثاق المدينة. ثم بين اهميته في التاريخ الإسلامي

মদীনার সনদ (মীসাকুল মদীনা)-এর সংজ্ঞা দিন। অতঃপর ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর "নবী জীবনী" গ্রন্থে মদীনার সনদ (সাহীফাতুল মদীনা) কে মদীনায় হিজরতের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের আলোকে এর সংজ্ঞা ও ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব নিম্নরূপ:

মদীনার সনদের সংজ্ঞা (تعريف ميثاق المدينة):

ড. সাল্লাবী মদীনার সনদকে একটি লিখিত চুক্তি বা সংবিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা মদীনার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই সনদে মূলত মুহাজির (মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলিম), আনসার (মদীনার স্থানীয় মুসলিম) এবং মদীনার অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে ইহুদী গোত্রগুলোর অধিকার ও কর্তব্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি সামাজিক চুক্তি যা মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ইসলামী ইতিহাসে মদীনার সনদের গুরুত্ব (أهمية ميثاق المدينة في التاريخ الإسلامي):

ড. সাল্লাবী মদীনার সনদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেছেন:

- প্রথম লিখিত সংবিধান (أول دستور مكتوب): তিনি এই সনদকে ইসলামের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা একটি সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর অধীনে একটি বহু-সাংস্কৃতিক সমাজকে একত্রিত করার নীতি নির্ধারণ করেছিল।
- রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন (تأسيس الدولة الإسلامية): ড. সাল্লাবী ব্যাখ্যা করেন যে এই সনদ মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং একটি সুসংহত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
- বহুত্ববাদ ও সহাবস্থানের নীতি (ترسيخ مبادئ التعددية والتعايش): তিনি উল্লেখ করেন যে এই সনদে মদীনার বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিশেষ করে ইহুদী গোত্রগুলোকে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং মুসলিমদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষার চুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়েছিল।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা (إرساء حكم القانون): ড. সাল্লাবী জোর দিয়ে বলেন যে এই সনদ আইনের শাসনের প্রাথমিক ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে সকল নাগরিক, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্যের অধীনে ছিল। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল।
- সামাজিক সংহতি ও ঐক্য (تعزيز التلاحم والوحدة الاجتماعية): তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই সনদ মদীনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য জোরদার করতে সহায়ক হয়েছিল। পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি এবং বিপদাপদে একে অপরের পাশে থাকার নীতি এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- উম্মাহর ধারণা (مفهوم الأمة): ড. সাল্লাবী ইঙ্গিত দেন যে এই সনদ একটি বৃহত্তর উম্মাহর ধারণার জন্ম দিয়েছিল, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি সম্প্রদায় গঠিত হয় এবং বিভিন্ন গোত্র ও জাতিসত্তার ঊর্ধ্বে একটি অভিন্ন পরিচয় তৈরি হয়।
- দূরদর্শী নেতৃত্ব (قيادة حكيمة ورشيدة): ড. সাল্লাবী এই সনদকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন, যিনি একটি জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচার, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর "নবী জীবনী" গ্রন্থে মদীনার সনদের এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন, যা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক নীতিমালা ও আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য অপরিহার্য।

٥- ما هي أبرز الأحداث التي وقعت في عهد الخلفاء الراشدين؟ اذكر بعض الإنجازات الهامة لكل خليفة.

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সংঘটিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো কী কী? প্রত্যেক খলীফার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন উল্লেখ কর।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সংঘটিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:

- **আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে:**
    - **রিদ্দার যুদ্ধ (حروب الردة):** নবীর ওফাতের পর কিছু আরব গোত্রের বিদ্রোহ দমন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্য পুনরুদ্ধার করা এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ড. সাল্লাবী এই যুদ্ধগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন।
    - **কুরআন সংকলন (جمع القرآن الكريم):** কুরআনের আয়াতসমূহকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে একত্রিত করে একটি সুসংহত গ্রন্থে রূপ দেওয়া হয়। ড. সাল্লাবী এই কাজটিকে ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ সংরক্ষণে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখেন।
    - **ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু (بداية الفتوحات الإسلامية):** ইরাক ও শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হয়।
- **উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে:**
    - **ব্যাপক সাম্রাজ্য বিস্তার (اتساع رقعة الدولة الإسلامية بشكل كبير):** পারস্য, মিশর এবং বৃহত্তর শাম (সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন, জর্ডান) মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ড. সাল্লাবী এই বিজয়গুলোকে ইসলামী শক্তির উত্থান এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সূচনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।
    - **প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্কার (إصلاحات إدارية ومالية):** রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) প্রতিষ্ঠা, ভূমি জরিপ, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং জনগণের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। ড. সাল্লাবী এই সংস্কারগুলোকে একটি সুসংগঠিত ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে মূল্যায়ন করেন।
    - **হিজরী ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন (وضع التقويم الهجري):** হিজরতকে ভিত্তি করে ইসলামী বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়।
- **উসমান ইবন আফফান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে:**
    - **কুরআনের আদর্শ অনুলিপি তৈরি ও বিতরণ (توحيد المصاحف وتوزيعها):** কুরআনের বিভিন্ন পঠনরীতি রোধ করে একটি নির্দিষ্ট কিরাতের (কুরআনের পঠনরীতি) ভিত্তিতে কুরআনের অনুলিপি তৈরি করে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হয়। ড. সাল্লাবী এই পদক্ষেপকে

কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

- **ইসলামী সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার (استمرار الفتوحات الإسلامية):** আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে।
- **অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সূচনা (بداية الفتن الداخلية):** খিলাফতের শেষদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয় যা পরবর্তীতে উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের কারণ হয়।

- **আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে:**
  - **অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও ফিতনা (الفتن الداخلية والحروب الأهلية):** উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় এবং সিফফিনের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধের মতো বড় ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ড. সাল্লাবী এই সময়কালকে মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করেন।
  - **খিলাফতের কেন্দ্র মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তর (نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة):** রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আলীকে (রাঃ) রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করতে হয়।

প্রত্যেক খলীফার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন:

- **আবু বকর (রাঃ):**
  - ইসলামের ঐক্য রক্ষা ও বিদ্রোহীদের দমন।
  - কুরআনুল কারীমের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন।
  - ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রাথমিক বিস্তার।
- **উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ):**
  - ব্যাপক সাম্রাজ্য বিস্তার ও সুসংহত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা।
  - ন্যায়বিচারভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।
  - হিজরী ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ।
- **উসমান ইবন আফফান (রাঃ):**
  - কুরআনের বিশুদ্ধ অনুলিপি তৈরি ও বিতরণ করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষা।
  - ইসলামী সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তার অব্যাহত রাখা।

- নৌবাহিনী গঠন।

- **আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ):**
  - জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক হিসেবে ফিকহ ও তাফসীরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
  - সাহসিকতা ও বীরত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা।
  - ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যদিও অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে তা কঠিন ছিল।

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর গ্রন্থে এই ঘটনা ও অর্জনগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ইসলামী ইতিহাসে এদের প্রভাব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

٦- اذكر أسباب الفتنة الكبرى التي وقعت في صدر الإسلام، وما هي أهم نتائجها على الأمة الإسلامية؟

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত ফিতনাতুল কুবরার কারণসমূহ উল্লেখ কর এবং মুসলিম উম্মাহর উপর এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিগুলো কী ছিল?

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর "নবী জীবনী: ঘটনাবলীর উপস্থাপন ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ" গ্রন্থে ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত "ফিতনাতুল কুবরা" (বড় ধরনের বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ)-এর কারণ এবং মুসলিম উম্মাহর উপর এর গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের আলোকে কারণ ও পরিণতিগুলো নিম্নরূপ:

ফিতনাতুল কুবরার কারণসমূহ:

ড. সাল্লাবী ফিতনাতুল কুবরার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করেছেন:

- উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে অসন্তোষ (الاستياء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه): ড. সাল্লাবী উল্লেখ করেন যে উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষদিকে কিছু প্রশাসনিক দুর্বলতা, আত্মীয়-স্বজনের নিয়োগ এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। এই অসন্তোষকে বিদ্রোহীরা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে।
- বিদ্রোহীদের ভূমিকা ও ষড়যন্ত্র (دور الخوارج والمنافقين وتآمرهم): তিনি ব্যাখ্যা করেন যে কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, বিশেষ করে খারেজী ও মুনাফিকরা উসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও গুজব ছড়িয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে মদীনায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করে।
- প্রাথমিক যুগের মর্যাদাবোধ ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব (قضية الأسبقية والنزاع على القيادة): ড. সাল্লাবী ইঙ্গিত দেন যে কিছু সাহাবীর মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের অবদান ও মর্যাদার কারণে নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা

ছিল। উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর এই দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয় এবং আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকে অনেকেই মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেন।

- উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত (استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه): ড. সাল্লাবী এই ঘটনাটিকে ফিতনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিদ্রোহীদের দ্বারা উসমান (রাঃ)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে তোলে।
- আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান (رفض البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه): উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেও, মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যান্য কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচার না করা পর্যন্ত আলীর প্রতি আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করেন। এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন আরও বাড়ে।
- সিফফিনের যুদ্ধ ও সালিশের ঘটনা (معركة صفين وقضية التحكيم): ড. সাল্লাবী এই যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সালিশের ঘটনাকে ফিতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে দেখেন। সালিশের ফলাফল আলীর কিছু সমর্থকের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং খারেজী নামক একটি চরমপন্থী দলের উত্থান ঘটায়।

ফিতনাতুল কুবরার গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি:

ড. সাল্লাবী ফিতনাতুল কুবরার মুসলিম উম্মাহর উপর বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন:

- মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গভীর বিভাজন (انقسام الأمة الإسلامية بشكل عميق): ফিতনার ফলে মুসলিমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে সুন্নি, শিয়া ও খারেজীসহ বিভিন্ন ফেরকার জন্ম দেয়। এই বিভাজন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে দুর্বল করে দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি করে।
- বহু সাহাবীর শাহাদাত (استشهاد العديد من الصحابة الكرام): এই ফিতনার সময় আলী (রাঃ), উসমান (রাঃ) সহ বহু প্রখ্যাত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বলতা (اضطراب سياسي وضعف في الدولة الإسلامية): দীর্ঘস্থায়ী অভ্যন্তরীণ সংঘাত ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে এবং এর দুর্বলতা প্রকাশ করে, যা পরবর্তীতে বহিঃশত্রুদের আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ইসলামের আদর্শের বিকৃতি (تشويه صورة الإسلام وقيمه): অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে ইসলামের শান্তি, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের একটি নেতিবাচক চিত্র তৈরি হয়।

- নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের উত্থান (ظهور مذاهب سياسية ودينية جديدة): ফিতনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের জন্ম হয়, যা মুসলিম চিন্তাধারাকে দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবিত করে। খারেজী, শিয়া এবং পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের রাজনৈতিক মতাদর্শ এই সময়ের ফসল।
- ঐতিহাসিক বর্ণনার বিকৃতি (تأثر الروايات التاريخية بالانتماءات السياسية): ফিতনার সময়কার ঘটনাগুলোর ঐতিহাসিক বর্ণনা দলীয় আনুগত্য ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার ফলে ঘটনার নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী তাঁর "নবী জীবনী" গ্রন্থে ফিতনাতুল কুবরার এই কারণ ও পরিণতিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করেছেন, যা ইসলামী ইতিহাসের একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

٧- من هم أهل البيت في الإسلام؟ وما هي مكانتهم وفضائلهم في الشريعة الإسلامية؟

ইসলামে আহলে বাইত কারা? ইসলামী শরীয়তে তাদের মর্যাদা ও ফজিলতসমূহ কী কী?

ইসলামে "আহলে বাইত" (أهل البيت) শব্দটি আভিধানিকভাবে "ঘরের লোক" বা "পরিবারের সদস্য" বোঝায়। তবে ইসলামী পরিভাষায় এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এবং এটি মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনদের বোঝায়।

আহলে বাইত কারা, এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে, তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী মতানুসারে, এর অন্তর্ভুক্ত হলেন:

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ (أزواج النبي صلى الله عليه وسلم): কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণিত। সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়; এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। আর তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩২-৩৩) এই আয়াতে "আহলাল বাইত" বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁদের মর্যাদা ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়গণ (ذوي القربى): এদের মধ্যে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত হলেন বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব। তবে অনেক আলেমের মতে, এখানে বিশেষভাবে

বোঝানো হয় আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ), ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (রাঃ), হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ও হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন।

ইসলামী শরীয়তে আহলে বাইতের মর্যাদা ও ফজিলতসমূহ:

ইসলামী শরীয়তে আহলে বাইতের বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও ফজিলত হলো:

১. কুরআনে তাঁদের পবিত্রতা ঘোষণা: সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে আহলে বাইতের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন ("আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।")। এটি তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার এক বড় প্রমাণ।

2. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও সম্মান: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইতকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সম্মান করতেন। তিনি বিশেষভাবে আলী (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)-এর প্রতি গভীর স্নেহ পোষণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

3. সালাতে তাঁদের উপর দরুদ পাঠের নির্দেশ: সালাতের শেষ বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করা উম্মতের জন্য সুন্নত। এটি তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের সুস্পষ্ট নিদর্শন। আমরা "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ..." বলে যে দরুদ পাঠ করি, তাতে রাসূল (সাঃ)-এর পাশাপাশি তাঁর "আলি" অর্থাৎ পরিবার-পরিজনের উপরও সালাত (রহমত) বর্ষণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

4. ফিতনা থেকে সুরক্ষা ও সত্যের অনুসরণ: আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁদের সম্মান করা ফিতনা থেকে সুরক্ষা এবং সত্যের অনুসরণে সহায়ক হতে পারে। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই দ্বীনের জ্ঞানে গভীর ছিলেন।

5. দান ও সদকাতে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা: বনু হাশিমের জন্য যাকাত ও সদকা গ্রহণ করা জায়েজ নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর হিসেবে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা অন্যভাবে সম্মান ও জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।

6. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস: আহলে বাইতের অনেক সদস্য দ্বীনের জ্ঞানে গভীর ছিলেন এবং তাঁরা উম্মতের জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সর্বজনবিদিত।

7. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার: আহলে বাইত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উত্তরাধিকার বহন করেন। তাঁদের জীবন ও আদর্শ উম্মতের জন্য অনুকরণীয়।

তবে, ইসলামী শরীয়তে আহলে বাইতের মর্যাদা ও ফজিলত থাকার অর্থ এই নয় যে তাঁরা শরীয়তের ঊর্ধ্বে বা তাঁদের কোনো ভুল হতে পারে না। তাঁরাও মানুষ ছিলেন এবং শরীয়তের বিধি-বিধান তাঁদের জন্যও প্রযোজ্য ছিল। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান পোষণ করা ঈমানের অংশ, তবে তাঁদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা বা তাঁদেরকে অতিমানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করা ইসলামী শিক্ষা নয়।

মোটকথা, আহলে বাইত ইসলামে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা মুমিনদের জন্য কল্যাণকর। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁদের মর্যাদা ও ফজিলত উপলব্ধি করা এবং তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

٨- عرف غزوة بدر الكبرى. وما هي أهم الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة؟

গাযওয়া-ই-বদরের সংজ্ঞা দাও। এই যুদ্ধ থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশসমূহ কী কী?

গাযওয়া-ই-বদরের সংজ্ঞা

গাযওয়া-ই-বদর (غزوة بدر الكبرى) ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম নির্ণায়ক যুদ্ধ। এটি হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রমজান (মতান্তরে ১৯শে রমজান) মক্কা থেকে আগত কুরাইশদের একটি বিশাল বাহিনীর সাথে মদীনার মুসলিমদের একটি ছোট দলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে এটি "গাযওয়া-ই-বদর" নামে পরিচিত। এই যুদ্ধটি মুসলিমদের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় বয়ে এনেছিল এবং ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

গাযওয়া-ই-বদর থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশসমূহ:

গাযওয়া-ই-বদর থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো:

১. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা: বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই কম (৩১৩ জন) এবং তাদের সরঞ্জামও অপ্রতুল ছিল, যেখানে কুরাইশদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার এবং তারা উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং আল্লাহ তাদের অভাবনীয় বিজয় দান করেছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সংখ্যা বা সরঞ্জামের স্বল্পতা ঈমান ও আল্লাহর উপর ভরসার কাছে তুচ্ছ।

2. ঐক্য ও আনুগত্যের গুরুত্ব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব এবং সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বদরের বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। মুসলিমরা তাদের নেতার নির্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করেছিল এবং কোনো প্রকার দ্বিধা প্রদর্শন করেনি। এই যুদ্ধ শিক্ষা দেয় যে, যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ঐক্য ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সাফল্য এনে দিতে পারে।

3. ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা: মুসলিমরা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। তারা তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য নয়, বরং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধ শিক্ষা দেয় যে, ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ঈমানদারের কর্তব্য।

4. পরিকল্পনা ও কৌশলের গুরুত্বের সাথে আল্লাহর সাহায্যের সমন্বয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের আগে স্থান নির্বাচন, সৈন্য বিন্যাস এবং যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একইসাথে তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন। এই ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, যেকোনো কাজে সফলতার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্যের উপরও নির্ভর করা উচিত।

5. শাহাদাতের মর্যাদা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস: বদরের যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সাহাবা কেরাম (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা যোগায়। এই যুদ্ধ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণের মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

6. ধৈর্য ও সাহসিকতার অপরিহার্যতা: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা এবং সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করা বদরের যুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা। মুসলিমরা কঠিন পরিস্থিতিতেও মনোবল হারায়নি এবং সাহসিকতার সাথে শত্রুদের মোকাবিলা করেছিল।

7. শত্রুদের দুর্বলতা ও আল্লাহর কৌশল: বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে পরাজিত হয়েছিল। তারা মনে করেছিল তাদের বিশাল বাহিনী মুসলিমদের সহজেই পরাজিত করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহর কৌশল তাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। এই ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, অহংকার পতনের মূল এবং আল্লাহর কৌশল সকল শক্তির ঊর্ধ্বে।

8. যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ: বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা বহু কুরাইশকে বন্দী করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবিক ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা যুদ্ধের ময়দানেও ইসলামের ন্যায়নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, গাযওয়া-ই-বদর শুধু একটি সামরিক বিজয়ই ছিল না, বরং এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য ঈমান, ঐক্য, ন্যায়নীতি, আল্লাহর উপর ভরসা এবং জিহাদের তাৎপর্য অনুধাবন করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশ আজও মুসলিমদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

٩- ما هي أهمية فتح مكة المكرمة في تاريخ الإسلام؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة بعد الفتح؟

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা মুকাররমা বিজয়ের গুরুত্ব কী? বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন?

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা মুকাররমা বিজয়ের গুরুত্ব

মক্কা মুকাররমা (মক্কা নগরী) বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক বিশাল ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে নতুন দিগন্তে উন্মোচিত করেছিল। নিম্নে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ও প্রতিষ্ঠা: মক্কা ছিল ইসলামের জন্মস্থান এবং কুরাইশরা ছিল ইসলামের প্রধান বিরোধী শক্তি। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কুরাইশদের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায় এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ও প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়।

2. কা'বা শরীফের পবিত্রতা পুনরুদ্ধার: মক্কা বিজয়ের পূর্বে কা'বা শরীফ মূর্তি ও পৌত্তলিকতার অপবিত্রতায় পূর্ণ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কা'বা থেকে ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ করেন এবং পুনরায় এটিকে আল্লাহর একত্ববাদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

3. আরব উপদ্বীপের একত্রীকরণ: মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্র বুঝতে পারে যে ইসলামের শক্তি অপ্রতিরোধ্য। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র আরব উপদ্বীপ একটি একক ইসলামী শাসনের অধীনে আসে।

4. শান্তিপূর্ণ বিজয় ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত: মক্কা বিজয় ছিল মূলত একটি রক্তপাতহীন বিজয়। যদিও কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল, তবে সাধারণভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ করেন। বিজয়ের পর তিনি দীর্ঘদিনের শত্রু কুরাইশদের প্রতি যে ক্ষমা ও উদারতা দেখিয়েছিলেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

5. ইসলামের সত্যতা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রমাণ: মক্কা বিজয় ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

6. ইসলামের প্রসারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন: মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের প্রচার আরও দ্রুত গতি লাভ করে। আরব উপদ্বীপের বাইরেও ইসলামের বার্তা পৌঁছাতে শুরু করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়।

7. একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা: মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, যেখানে ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কাবাসীদের সাথে আচরণ

মক্কা বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন, তা ছিল ক্ষমা, উদারতা ও মহানুভবতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। দীর্ঘদিনের শত্রু এবং যারা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল, তাদের প্রতি তিনি যে মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর আচরণের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হলো:

- সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করেন, "আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।" (লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওম, ইযহাবূ ফান্তুমুত তুলাকা)। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিনের শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন নির্বাপিত করেন।

- কা'বার চাবি হস্তান্তর: কা'বার চাবি দীর্ঘকাল ধরে উসমান ইবনে তালহা (রাঃ)-এর পরিবারের কাছে ছিল। বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চাবি তাদের কাছেই ফিরিয়ে দেন, যা ন্যায়বিচার ও আমানত রক্ষার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

- কাউকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা না করা: যারা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, এমনকি হত্যার চেষ্টা করেছিল, তাদের কাউকেই তিনি তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করেননি।

- নিরাপত্তা প্রদান: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে যারা মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে, যারা নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে থাকবে এবং যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ থাকবে। এর মাধ্যমে তিনি নগরীর শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

- ধৈর্য ও সহনশীলতা: মক্কাবাসীদের অনেকেই দ্বিধায় ভুগছিলেন এবং তাদের অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখান এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও ক্ষমা সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

- ইসলামের দাওয়াত: বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। তাঁর ক্ষমা ও উদারতা দেখে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহানুভবতাপূর্ণ আচরণ মক্কাবাসীদের হৃদয় জয় করে এবং ইসলামের দ্রুত প্রসারে সহায়ক হয়। এটি বিশ্ববাসীকে ক্ষমা, সহনশীলতা ও শত্রুদের প্রতিও উদারতা প্রদর্শনের এক অনুপম শিক্ষা দেয়।

١٠- اذكر نبذة مختصرة عن حياة إحدى الشخصيات النسائية البارزة في صدر الإسلام، وبين دورها في خدمة الدين الإسلامي.

ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং দ্বীন ইসলামের খেদমতে তার ভূমিকা বর্ণনা কর।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহু মহীয়সী নারী তাঁদের জ্ঞান, ত্যাগ, সাহস ও নিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)।

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন:

খাদিজা (রাঃ) ছিলেন মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী মহিলা। তাঁর পিতার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ এবং মাতার নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ ও সম্মানিতা নারী। জাহেলী যুগেও তিনি 'তাহিরা' (পবিত্র) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের পূর্বে খাদিজা (রাঃ) তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে তাঁকে ব্যবসার দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। এই সফরে রাসূল (সাঃ)-এর অসাধারণ সততা ও বরকত দেখে খাদিজা (রাঃ) মুগ্ধ হন এবং পরবর্তীতে তিনি রাসূল (সাঃ)-কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ২৫ বছর, তখন ৪০ বছর বয়সে খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

খাদিজা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোনো বিবাহ করেননি। রাসূল (সাঃ) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। খাদিজা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর সকল সন্তানের জননী, একমাত্র ইব্রাহিম (রাঃ) ব্যতীত, যিনি মারিয়া কিবতিয়্যা (রাঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

নবুওয়ত লাভের পর খাদিজা (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন। হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে মক্কায় ৬৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মু'আল্লায় দাফন করা হয়।

দ্বীন ইসলামের খেদমতে খাদিজা (রাঃ)-এর ভূমিকা:

খাদিজা (রাঃ) দ্বীন ইসলামের খেদমতে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যা তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান হলো:

১. প্রথম ঈমান আনয়নকারী: খাদিজা (রাঃ) ছিলেন নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীতে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। নবুওয়তের কঠিন সময়ে তিনি দ্বিধাহীনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন।

2. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বাত্মক সমর্থন: নবুওয়তের শুরুতে যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর ভারে ভীত ও চিন্তিত ছিলেন, তখন খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দেন, সাহস জোগান এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-কে বলেন, "আল্লাহ কখনই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, দরিদ্রদের দান করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।"

3. সম্পদ উৎসর্গ: খাদিজা (রাঃ) ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর সকল ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তুলে দেন, যা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যয় হয়। বিশেষ করে মক্কার দুর্বল ও অসহায় মুসলিমদের সাহায্যার্থে তাঁর সম্পদ বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল।

4. মানসিক সমর্থন ও সান্ত্বনা: মক্কার কাফেরদের বিরোধিতা ও নির্যাতনে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা কঠিন সময় পার করছিলেন, তখন খাদিজা (রাঃ)-এর মানসিক সমর্থন ও সান্ত্বনা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য এক বিশাল শক্তি ছিল। তিনি সর্বদা রাসূল (সাঃ)-এর পাশে ছিলেন এবং তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন।

5. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস: খাদিজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর এই ভালোবাসা ও বিশ্বাস রাসূল (সাঃ)-কে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছিল।

6. সাহাবীদের জন্য আশ্রয়: প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সাহাবী খাদিজা (রাঃ)-এর কাছে আশ্রয় নিতেন এবং তিনি সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর অবদানের কথা সর্বদা স্মরণ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরও গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করতেন। আয়েশা (রাঃ) সহ অন্যান্য স্ত্রীগণও খাদিজা (রাঃ)-এর মর্যাদা ও রাসূল (সাঃ)-এর ভালোবাসার কথা স্বীকার করতেন।

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য নারী। দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ঈমান, ত্যাগ, সমর্থন ও সম্পদ উৎসর্গ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনীই ছিলেন না, বরং ইসলামের একজন একনিষ্ঠ খাদেমও ছিলেন।

(খ. ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস)

১. ما معنى التفسير وما الفرق بين التفسير والتأويل؟ وما المراد بالتفسير بالماثورة بين مفصلا

তাফসীর অর্থ কী? তাফসীর ও তা'বীল-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এবং তাফসীর বিল মাছূর (বর্ণনানির্ভর তাফসীর) বলতে কী বোঝায়? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস:

১. তাফসীরের অর্থ, তাফসীর ও তা'বীল-এর মধ্যে পার্থক্য এবং তাফসীর বিল মাছূর:

তাফসীরের অর্থ (معنى التفسير):

আরবি ভাষায় "তাফসীর" (تفسير) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো:

- স্পষ্ট করা (الإيضاح): কোনো অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলা।
- ব্যাখ্যা করা (التبيين): কোনো কথার অর্থ খুলে বলা বা তার মর্মার্থ বর্ণনা করা।
- উন্মোচন করা (الكشف): কোনো লুকানো বা আবৃত বিষয়কে প্রকাশ করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় "তাফসীর" বলতে কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের অর্থ, মর্ম, তাৎপর্য, প্রেক্ষাপট এবং বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করাকে বোঝায়। একজন মুফাসসির কুরআন মাজীদের ভাষাগত দিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শানে নুযুল (আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ), সংশ্লিষ্ট হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈনদের মতামত এবং আরবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যবহার করে আয়াতের সঠিক অর্থ উদ্ঘাটন করেন।

তাফসীর ও তা'বীল-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين التفسير والتأويل):

"তাফসীর" ও "তা'বীল" (تأويل) শব্দ দুটি প্রায়শই একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও, আলেমদের মধ্যে এগুলোর সূক্ষ্ম পার্থক্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান দুটি মত উল্লেখযোগ্য:

প্রথম মত: অধিকাংশ আলেমের মতে, তাফসীর হলো আয়াতের সুস্পষ্ট ও বাহ্যিক অর্থ বর্ণনা করা, যা শাব্দিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, তা'বীল হলো আয়াতের অন্তর্নিহিত বা গূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা করা, যা ভাষাগত ইঙ্গিত, শরীয়তের মূলনীতি এবং গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। এই মতানুসারে, তাফসীরের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, তবে তা'বীল-এর জন্য গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় মত: কিছু আলেমের মতে, তাফসীর হলো নিশ্চিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কুরআনের অর্থ বর্ণনা করা, যেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, তা'বীল হলো অনুমানের উপর ভিত্তি করে কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা করা, যেখানে একাধিক সম্ভাবনা থাকে। এই মতানুসারে, শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই কুরআনের প্রকৃত তা'বীল জানেন, তবে আলেমগণ তাদের জ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে এর কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

তবে, সাধারণভাবে বলা যায় যে, তাফসীর হলো আয়াতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থের ব্যাখ্যা, যা বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। আর তা'বীল হলো আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাখ্যা, যা যুক্তি, বুদ্ধি ও শরীয়তের অন্যান্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে করা হয়।

তাফসীর বিল মাছূর (التفسير بالماثورة) বলতে কী বোঝায়? (المراد بالتفسير بالماثورة):

"তাফসীর বিল মাছূর" (التفسير بالماثورة) হলো কুরআনুল কারীমের ঐ প্রকার তাফসীর, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার উপর ভিত্তি করে করা হয়। "মাছুর" (ماثور) শব্দের অর্থ হলো যা বর্ণিত হয়েছে বা যা ঐতিহ্য সূত্রে পাওয়া গেছে। সুতরাং, তাফসীর বিল মাছূর মূলত নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনার আলোকে কুরআন মাজীদের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে:

- কুরআনুল কারীম: কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করা। অনেক সময় কুরআনের কোনো সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য বিস্তারিত বা সুস্পষ্ট আয়াতে পাওয়া যায়।
- সুন্নাহ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস): রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কুরআনের প্রথম মুফাসসির। তিনি তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে কুরআনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে সরাসরি তাফসীর জেনেছেন।
- সাহাবায়ে কেরামের উক্তি (اقوال الصحابة): সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন এবং কুরআনের অবতরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। কুরআনের জ্ঞান ও এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁদের গভীর ধারণা ছিল। তাই তাঁদের প্রদত্ত তাফসীরও তাফসীর বিল মাছূরের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের সকল উক্তি দলীল হিসেবে গণ্য হয় না; যে সকল তাফসীর তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন বা যা ইজমা (ঐকমত্য)-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোই মূলত গ্রহণযোগ্য।
- তাবেঈনদের উক্তি (اقوال التابعين): তাবেঈনগণ সাহাবায়ে কেরামের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা প্রখ্যাত মুফাসসির ছিলেন, যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ, তাঁদের প্রদত্ত তাফসীরও তাফসীর বিল মাছূরের অন্তর্ভুক্ত। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের মতামত সাহাবায়ে কেরামের মতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সাহাবায়ে কেরামের মত প্রাধান্য পাবে।

তাফসীর বিল মাছূরকে তাফসীরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এর ভিত্তি হলো স্বয়ং কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেঈনদের বিশুদ্ধ বর্ণনা। এই পদ্ধতিতে মুফাসসির নিজের ব্যক্তিগত মতামত বা খেয়ালখুশির পরিবর্তে বর্ণিত দলিলের উপর নির্ভর করে কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

সংক্ষেপে, তাফসীর হলো কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, তাফসীর ও তা'বীল-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যেখানে তা'বীল অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে, এবং তাফসীর বিল মাছূর হলো কুরআন, হাদীস ও সাহাবা-তাবেঈনদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করা।

٢. ما العلوم التي يحتاج اليها المفسر في تفسير القرآن بين مفصلا

কুরআন তাফসীরের জন্য একজন মুফাসসিরের (ভাষ্যকারের) কী কী জ্ঞানের শাখা প্রয়োজন? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

কুরআন তাফসীরের জন্য একজন মুফাসসিরের (ভাষ্যকারের) বহুবিধ জ্ঞানের শাখা আয়ত্ত করা অপরিহার্য। কুরআন আল্লাহর বাণী, যা মানবজাতির পথপ্রদর্শক। এর সঠিক মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। একজন মুফাসসিরকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের শাখাগুলোতে পারদর্শী হতে হয়:

১. ইলমুল লুগাহ ওয়াল আদাব (علم اللغة والأدب - ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান):

- আল-লুগাতুল আরাবিয়্যাহ আল-ফুসহা (اللغة العربية الفصحى - বিশুদ্ধ আরবি ভাষা): কুরআনের ভাষা হলো বিশুদ্ধ আরবি। একজন মুফাসসিরকে আরবি ভাষার ব্যাকরণ (নাহু ও সরফ), শব্দভাণ্ডার (মুফরাদাত), বাগধারা (মুস্তালাহাত), অলঙ্কার শাস্ত্র (বালাগাহ - ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বায়ান, ইলমুল বাদী') এবং আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কুরআনের প্রতিটি শব্দের সঠিক অর্থ, শাব্দিক তাৎপর্য এবং বাক্য গঠনে এর ভূমিকা বুঝতে পারা জরুরি।
- ইলমুল ইশতিকাক (علم الاشتقاق - ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র): শব্দের মূল (root) এবং বিভিন্ন রূপে তার পরিবর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারা। একই মূল থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন শব্দের অর্থের পার্থক্য অনুধাবন করা আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যায় সহায়ক।
- আশ'আরুল আরব (أشعار العرب - আরবদের কবিতা): জাহেলী যুগের ও প্রাথমিক ইসলামী যুগের আরবি কবিতা কুরআনের অনেক শব্দ ও বাক্যবন্ধের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। কারণ কুরআন সেই যুগের মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে।

২. ইলমুন নাহু ওয়াস সরফ (علم النحو والصرف - আরবি ব্যাকরণ):

- বাক্যের গঠন, পদের কারক (ই'রাব), ক্রিয়ার কাল ও প্রকারভেদ এবং শব্দের রূপান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কুরআনের বাক্যগুলোর সঠিক ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ আয়াতের অর্থ নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামান্য ব্যাকরণগত ভুলও অর্থের বিকৃতি ঘটাতে পারে।

৩. ইলমুল বালাগাহ (علم البلاغة - অলঙ্কার শাস্ত্র):

- কুরআনের ভাষাশৈলী অনুপম ও অলৌকিক। এর সৌন্দর্য ও গভীরতা অনুধাবন করতে ইলমুল বালাগাহর জ্ঞান অপরিহার্য। এর তিনটি প্রধান শাখা:
    - ইলমুল মা'আনী (علم المعاني): বক্তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাক্য গঠনে বিভিন্ন পদ্ধতির জ্ঞান।
    - ইলমুল বায়ান (علم البيان): উপমা (تشبيه), রূপক (استعارة), ইঙ্গিত (كناية) ও সাদৃশ্য (مجاز) ইত্যাদি অলঙ্কার সম্পর্কে জ্ঞান।
    - ইলমুল বাদী' (علم البديع): ভাষাগত সৌন্দর্য ও মাধুর্য সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান।

৪. ইলমুল উসূলুত তাফসীর (علم أصول التفسير - তাফসীরের নীতিমালা):

- কুরআনের তাফসীর করার সঠিক পদ্ধতি ও নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে রয়েছে:
    - কুরআনের কোন আয়াত কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করে।
    - সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যার নীতিমালা।
    - সাহাবা ও তাবেঈনদের মতামতের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড।
    - ইজমা (ঐকমত্য) ও কিয়াস (অনুমিতি)-এর ভূমিকা।
    - নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান।
    - আম (সাধারণ) ও খাস (বিশেষ), মুতলাক (নিঃশর্ত) ও মুকাইয়্যাদ (সশর্ত) আয়াতের নীতিমালা।
    - মুহকাম (স্পষ্ট) ও মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের নিয়ম।

৫. ইলমুল হাদীস ওয়া উসূলুল হাদীস (علم الحديث وأصول الحديث - হাদীস ও হাদীসের নীতিমালা):

- কুরআনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীসে বিদ্যমান। তাই একজন মুফাসসিরকে বিশুদ্ধ হাদীস নির্বাচন, হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) ও মতন (মূল বক্তব্য) যাচাই এবং হাদীসের বিভিন্ন প্রকার (সহীহ, হাসান, যঈফ, মাওযু') সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে।
- হাদীসের পরিভাষা (মুস্তালাহাতুল হাদীস) এবং ফিকহুল হাদীস (হাদীসের অন্তর্নিহিত বিধান) সম্পর্কে জ্ঞানও জরুরি।

৬. ইলমুস সীরাহ আন-নববিয়্যাহ ওয়াল তারীখুল ইসলামী (علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي - নবীর জীবনী ও ইসলামী ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান):

- কুরআনের অনেক আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, বিভিন্ন ঘটনা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত। তাই একজন মুফাসসিরকে রাসূল (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবন, সাহাবাদের জীবন, বিভিন্ন যুদ্ধ (গাযওয়া ও সারিয়্যা) এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

৭. ইলমু আশ-শানে নুযূল (علم أسباب النزول - আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বিষয়ক জ্ঞান):

- কুরআনের প্রতিটি আয়াত কোনো না কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) জানা থাকলে আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হয় এবং অনেক ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৮. ইলমুল ফিকহ ওয়াল উসূলুল ফিকহ (علم الفقه وأصول الفقه - ইসলামী আইন ও ইসলামী আইনের নীতিমালা):

- কুরআনের অনেক আয়াতে শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। একজন মুফাসসিরকে ইসলামী আইনের মূলনীতি (উসূলুল ফিকহ), বিভিন্ন ফিকহী মাযহাব এবং আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

৯. ইলমুল আকাইদ (علم العقائد - বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞান):

- কুরআনের মৌলিক বিষয় হলো তাওহীদ (একত্ববাদ), রিসালাত (নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস), আখিরাত (পরকাল) ইত্যাদি। একজন মুফাসসিরকে ইসলামী আকীদার মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে এবং ভ্রান্ত আকীদা থেকে কুরআনকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে।

১০. আল-ইলম বি উলূমিল কুরআন আল-উখরা (العلم بعلوم القرآن الأخرى - কুরআনের অন্যান্য জ্ঞান বিষয়ক শাখা):

- কুরআনের নাযিল হওয়ার পদ্ধতি (কিয়ামুল কুরআন), মক্কী ও মাদানী আয়াতের বৈশিষ্ট্য, কুরআনের সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, কুরআনের কিরাআত (বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি) ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সহায়ক।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআন তাফসীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। একজন মুফাসসিরকে উপরোক্ত জ্ঞানের শাখাগুলোতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়, যাতে তিনি আল্লাহর কালামের সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন এবং উম্মতকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হন। জ্ঞানের স্বল্পতা বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কুরআনের ভুল অর্থ প্রচারিত হতে পারে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

٣. على وكيف بدأ تدوين التفسير؟ اكتب مفصلا

কখন এবং কিভাবে তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল? বিস্তারিতভাবে লিখ।

তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু না হলেও এর বীজ তখনই বপন হয়েছিল। পরবর্তীতে সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে।

কখন তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল:

তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়:

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ: এই যুগে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই সাহাবাদের (রাঃ) কাছে এর ব্যাখ্যা দিতেন। সাহাবারা (রাঃ) কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য মুখস্থ করতেন এবং একে অপরের সাথে আলোচনা করতেন। তবে এই সময়ে কুরআনের তাফসীর স্বতন্ত্র গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করার কোনো ব্যাপক প্রচলন ছিল না। কিছু সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে রাখতেন বলে জানা যায়, তবে তা ছিল বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কুরআনের তাফসীর স্বতন্ত্রভাবে লেখার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ বা ব্যাপক উৎসাহ দেননি। এর কারণ সম্ভবত ছিল কুরআন মুখস্থ করার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং তখন পর্যন্ত পূর্ণ কুরআন সংকলিত না হওয়া।
- সাহাবা কেরামের যুগ (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর): রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের প্রধান উৎসে পরিণত হন। তাঁদের মধ্যে যারা কুরআনের জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যেমন আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ, তাঁরা বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তরে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা দিতেন। এই যুগের তাফসীর মূলত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে কিছু সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের কিছু অংশের ব্যাখ্যা লিখে রাখতেন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র মুজাহিদ (রহ.)-এর তাফসীরকে এই যুগের প্রথম দিকের লিপিবদ্ধ তাফসীর হিসেবে গণ্য করা হয়, যদিও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ আমাদের কাছে পৌঁছেনি।
- তাবেঈনদের যুগ: এই যুগে তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজটি একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। তাবেঈনগণ সাহাবা কেরামের কাছ থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁরা কুরআনের ব্যাখ্যাকে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে চর্চা করতে শুরু করেন। এই সময়ে মক্কা, মদীনা ও ইরাককে কেন্দ্র করে তাফসীরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। মুজাহিদ (রহ.), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.), হাসান আল-বাসরী (রহ.), কাতাদা (রহ.), ইকরিমা (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত তাবেঈন মুফাসসির হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের প্রদত্ত তাফসীরসমূহ মৌখিক ও লিখিত উভয়ভাবেই প্রচারিত হতে থাকে। তবে এই যুগেরও কোনো পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ এককভাবে পাওয়া যায় না, বরং বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থে তাঁদের উক্তি বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

কিভাবে তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল:

তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণতা লাভ করে:

১. প্রাথমিক পর্যায় (ব্যক্তিগত উদ্যোগ): রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে কিছু সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে রাখতেন। এর কোনো সুসংগঠিত রূপ ছিল না।

2. মৌখিক বর্ণনার বিস্তার: সাহাবা কেরামের যুগে তাফসীরের মূল ভিত্তি ছিল মৌখিক বর্ণনা। কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শোনা অথবা তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান ও উপলব্ধির আলোকে ব্যাখ্যা করতেন।
3. তাবেঈনদের শিক্ষাকেন্দ্র: তাবেঈনদের যুগে মক্কা, মদীনা ও ইরাকে তাফসীরের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখানে সাহাবাদের শিষ্যরা কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন এবং শিক্ষার্থীরা তা লিপিবদ্ধ করতেন।
4. হাদীসের সাথে সংমিশ্রণ: প্রাথমিক পর্যায়ে তাফসীর স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হতো। এটি তাফসীর লিপিবদ্ধ করার একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া ছিল।
5. স্বতন্ত্র তাফসীর সংকলনের সূচনা: তাবেঈনদের শেষ দিকে এবং তৎপরবর্তী যুগে কুরআনের তাফসীর স্বতন্ত্র গ্রন্থ আকারে সংকলন করার কাজ শুরু হয়। এই সময়ে সংকলিত তাফসীরগুলোতে মূলত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈনদের উক্তি এবং আয়াতের শানে নুযূল ইত্যাদি বিষয় স্থান পেত।
6. বিভিন্ন পদ্ধতির বিকাশ: পরবর্তীতে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ও মূলনীতি তৈরি হয়, যেমন তাফসীর বিল মাছূর (বর্ণনানির্ভর তাফসীর), তাফসীর বির রায় (বিচক্ষণতানির্ভর তাফসীর), এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত তাফসীর (যেমন ফিকহী তাফসীর, ভাষাতাত্ত্বিক তাফসীর ইত্যাদি)।

সুতরাং, বলা যায় যে তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ব্যক্তিগত ও বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও, সাহাবা ও বিশেষ করে তাবেঈনদের যুগে এটি একটি সুস্পষ্ট ধারা লাভ করে এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। এই প্রক্রিয়াটি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন নিয়ম ও পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে।

٤. من الذين اشتهروا في التفسير من الصحابة ؟ بين مزايا التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারা তাফসীরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা তাফসীরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন:

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

- খুলাফায়ে রাশেদীন (চার খলিফা):
    - আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ): তিনি কুরআনের গভীর জ্ঞান ও ব্যাখ্যার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে বহু তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।

- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ): তিনি কুরআনের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন এবং বহু আয়াতের তাফসীর প্রদান করেছেন।
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ): তাঁকে "তারজুমানুল কুরআন" বা কুরআনের অনুবাদক বলা হত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্য কুরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের দোয়া করেছিলেন।
- উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ): তিনি কুরআনের একজন বিখ্যাত কারী ও আলেম ছিলেন এবং তাফসীরের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে।

- অন্যান্য প্রখ্যাত সাহাবী:
  - যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ): তিনি কুরআন সংকলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং কুরআনের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
  - আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ): তিনিও কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিচিত ছিলেন।
  - আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ): তাঁর থেকেও কিছু তাফসীর বর্ণিত হয়েছে।
  - আনাস ইবনে মালেক (রাঃ): রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খাদেম হিসেবে তিনি অনেক আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত ছিলেন।
  - আয়েশা (রাঃ): রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রী হিসেবে তিনি অনেক আয়াতের শানে নুযূল (নাজিলের প্রেক্ষাপট) সম্পর্কে জানতেন এবং কিছু আয়াতের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।
  - জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ): তিনিও কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
  - আবু হুরায়রা (রাঃ): যদিও তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক প্রসিদ্ধ, তবুও কিছু তাফসীর তাঁর থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্য:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআনের তাফসীরের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল:

১. প্রধান উৎস ও ব্যাখ্যাকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ): কুরআনের কোনো আয়াত বুঝতে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মধ্যে কোনো দ্বিধা সৃষ্টি হলে তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তিনিই ছিলেন এর একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারী।

২. ওহীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা সরাসরি ওহীর মাধ্যমে লাভ করতেন। তাই তাঁর ব্যাখ্যা ছিল নির্ভুল ও চূড়ান্ত।

৩. সহজ ও সরল ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআনের আয়াতগুলোর সহজ ও সরল ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, যা সাহাবাদের (রাঃ) জন্য বুঝতে সহজ হত। তিনি জটিল বা দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা পরিহার করতেন।

৪. আয়াতের প্রেক্ষাপট ও শানে নুযূলের জ্ঞান: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবাদের (রাঃ) আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযূল) সম্পর্কে অবগত করতেন, যা আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে সহায়ক ছিল।

৫. আমলী প্রয়োগের উপর গুরুত্ব: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু আয়াতের শাব্দিক অর্থই ব্যাখ্যা করতেন না, বরং সেই আয়াতের বাস্তব জীবনে আমল বা প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে তাও শিক্ষা দিতেন।
৬. বিশেষজ্ঞ সাহাবাদের প্রশিক্ষণ: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু সাহাবীকে কুরআনের জ্ঞান ও তাফসীরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।
৭. স্বতন্ত্র গ্রন্থের অনুপস্থিতি: এই যুগে কুরআনের তাফসীর স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা মুখস্থ করতেন এবং একে অপরের কাছে বর্ণনা করতেন।
৮. তাফসীরের ভিত্তি ছিল কুরআন ও হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাফসীরের মূল ভিত্তি ছিল স্বয়ং কুরআন এবং তাঁর নিজস্ব হাদীস ও সুন্নাহ। তিনি এই দুটির আলোকেই কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করতেন।
৯. সমগ্র কুরআনের তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা ছিল না: যেহেতু কুরআন ধীরে ধীরে নাজিল হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবসময় সাহাবাদের (রাঃ) কাছে উপস্থিত ছিলেন, তাই সেই সময়ে সমগ্র কুরআনের বিস্তারিত তাফসীরের তেমন প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। যখনই কোনো আয়াত বোঝার প্রয়োজন হতো, তখনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সমাধান দিতেন।
মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআনের তাফসীর ছিল সরাসরি ওহীনির্ভর, সহজবোধ্য এবং আমলযোগ্য। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন এর প্রধান উৎস ও ব্যাখ্যাকারী।

٥. اذكر أهم المراحل التاريخية لتطورعلم التفسير، وبين خصائص كل مرحلة بإيجاز.

ইলমুত তাফসীরের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায়গুলো উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

ইলমুত তাফসীরের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায়গুলো নিম্নরূপ:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ (নবুওয়ত থেকে ১১ হিজরী):

- বৈশিষ্ট্য:
    - প্রধান উৎস ও ব্যাখ্যাকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ): কুরআনের কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সরাসরি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন।
    - ওহীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা: অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আসত।
    - সহজ ও সরল ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জটিলতা পরিহার করে সহজভাবে আয়াতের অর্থ বুঝিয়ে দিতেন।
    - আয়াতের প্রেক্ষাপট জ্ঞান: তিনি সাহাবাদের (রাঃ) আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযূল) সম্পর্কে অবহিত করতেন।

- আমলী প্রয়োগের উপর জোর: শুধু শাব্দিক অর্থ নয়, আয়াতের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের শিক্ষা দিতেন।
- স্বতন্ত্র গ্রন্থ অনুপস্থিত: এই সময়ে তাফসীর কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভরশীল ছিল।

২. সাহাবা কেরামের যুগ (১১ হিজরী থেকে ৪০ হিজরী):

- বৈশিষ্ট্য:
  - সাহাবাদের (রাঃ) প্রধান ভূমিকা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুরআনের ব্যাখ্যার প্রধান উৎসে পরিণত হন।
  - মৌখিক বর্ণনার প্রাধান্য: এই যুগেও তাফসীর মূলত মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই প্রচারিত হতো।
  - ব্যক্তিগত নোটের প্রচলন: কিছু সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে রাখতেন।
  - বিভিন্ন মতের উদ্ভব: সাহাবাদের মধ্যে কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত দেখা যায়, যা ইজতেহাদের সূচনা করে।
  - রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস ও পূর্ববর্তী কিতাবের জ্ঞান: তাফসীরের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস এবং আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খ্রীষ্টান) থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য ব্যবহৃত হতো, তবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে।
  - প্রখ্যাত মুফাসসির সাহাবী: আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ এই যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসির ছিলেন।

৩. তাবেঈনদের যুগ (৪১ হিজরী থেকে প্রায় ১০০ হিজরী):

- বৈশিষ্ট্য:
  - তাফসীর একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা: এই যুগে তাফসীর একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে চর্চা শুরু হয়।
  - শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা: মক্কা, মদীনা ও ইরাককে কেন্দ্র করে তাফসীরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।
  - মৌখিক বর্ণনার পাশাপাশি লিপিবদ্ধকরণের সূচনা: তাবেঈনগণ সাহাবাদের কাছ থেকে শোনা তাফসীর লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন।
  - বিভিন্ন ধারার উদ্ভব: মক্কী ধারা (ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র), মাদানী ধারা (উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর ছাত্র) ও ইরাকী ধারা (ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ছাত্র) ইত্যাদি বিভিন্ন তাফসীর ধারা সৃষ্টি হয়।

- ইসরাঈলিয়্যাতের অনুপ্রবেশ: আহলে কিতাবদের থেকে কিছু ভিত্তিহীন বা দুর্বল বর্ণনা (ইসরাঈলিয়্যাত) তাফসীরের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে।
- প্রখ্যাত মুফাসসির তাবেঈ: মুজাহিদ (রহ.), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.), হাসান আল-বাসরী (রহ.), কাতাদা (রহ.), ইকরিমা (রহ.) প্রমুখ এই যুগের বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন।

৪. তাফসীর সংকলনের যুগ (১০০ হিজরী থেকে ৩০০ হিজরী):

- বৈশিষ্ট্য:
  - স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ: এই যুগে স্বতন্ত্রভাবে তাফসীর গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু হয়।
  - হাদীসের সাথে তাফসীরের সংমিশ্রণ: প্রাথমিক তাফসীর গ্রন্থগুলোতে হাদীসের বর্ণনার সাথে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা একত্রিত করা হয়।
  - তাফসীর বিল মাছূরের প্রাধান্য: বর্ণনানির্ভর তাফসীর (কুরআন, হাদীস ও সাহাবা-তাবেঈনদের উক্তির ভিত্তিতে তাফসীর) এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।
  - ইসরাঈলিয়্যাতের ব্যাপক বিস্তার: এই যুগে ইসরাঈলিয়্যাতের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়, অনেক মুফাসসির যাচাই না করে এগুলো তাদের তাফসীরে উল্লেখ করেন।
  - প্রখ্যাত মুফাসসির: তাবারী (রহ.)-এর "জামি'উল বায়ান আন তা'বীল আয়িল কুরআন" এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ। এছাড়াও ইবনে আবী হাতিম (রহ.), ইবনে জারীর (রহ.) প্রমুখের তাফসীর উল্লেখযোগ্য।

৫. তাফসীর বির রায় (যুক্তিভিত্তিক তাফসীর)-এর বিকাশ ও সমন্বয়ের যুগ (৩০০ হিজরী থেকে বর্তমান):

- বৈশিষ্ট্য:
  - যুক্তি ও বিচক্ষণতার ব্যবহার: এই যুগে শুধু বর্ণনার উপর নির্ভর না করে যুক্তি, ভাষাতত্ত্ব ও শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতির আলোকে তাফসীর করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। একে "তাফসীর বির রায়" বলা হয়।
  - বিভিন্ন বিশেষায়িত তাফসীরের উদ্ভব: ফিকহী তাফসীর (আইন বিষয়ক), কালামী তাফসীর (তত্ত্ব বিষয়ক), সূফী তাফসীর (তাসাউফ বিষয়ক), বৈজ্ঞানিক তাফসীর ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষায়িত তাফসীর রচিত হয়।
  - ইসরাঈলিয়্যাত পরিহারের চেষ্টা: অনেক মুফাসসির ইসরাঈলিয়্যাত পরিহার করে বিশুদ্ধ বর্ণনার উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেন।
  - সমন্বয় ও সমালোচনার প্রয়াস: পূর্ববর্তী যুগের তাফসীরগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দুর্বল বা ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলোর সমালোচনা করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

- আধুনিক যুগের প্রভাব: আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা চলছে।
- প্রখ্যাত মুফাসসির: কুরতুবী (রহ.), ইবনে কাসীর (রহ.), জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.), আল্লামা তাবাতাবায়ী (রহ.), সায়্যিদ কুতুব (রহ.) প্রমুখ এই যুগের উল্লেখযোগ্য মুফাসসির। আধুনিক যুগেও বহু মুফাসসির কুরআন তাফসীরের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

এই ঐতিহাসিক পর্যায়গুলো ইলমুত তাফসীরের ক্রমবিকাশ এবং সময়ের সাথে সাথে এর পদ্ধতির পরিবর্তন ও সমৃদ্ধিকে তুলে ধরে। প্রতিটি যুগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অবদান রয়েছে যা কুরআনকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করেছে।

٦. ما هي أشهر مدارس التفسير في العصر الإسلامي الأول؟ وما هي أبرز مناهجها وعلماؤها؟

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাফসীরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলো কী কী ছিল? এবং সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও আলেমগণ কারা ছিলেন?

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাফসীরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলো ছিল মূলত তিনটি প্রধান কেন্দ্রে অবস্থিত:

১. মক্কা মাযহাব (মাদ্রাসাতু মাক্কা):

- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আলেম: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন: "হে আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন এবং তাকে তাফসীর শিক্ষা দিন।"
- গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
  - কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের অন্য আয়াতের সাহায্য নেওয়া।
  - রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের উপর নির্ভর করা।
  - আরবী ভাষার জ্ঞান ও কবিতার ব্যবহার।
  - সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ব্যাখ্যার অনুসরণ।
  - প্রয়োজনে ইজতেহাদের আশ্রয় নেওয়া।
- প্রখ্যাত আলেমগণ: সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.), মুজাহিদ (রহ.), ইকরিমা (রহ.), তাউস ইবনে কায়সান আল-ইয়ামানী (রহ.), আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) প্রমুখ।

২. মদীনা মাযহাব (মাদ্রাসাতুল মদীনা):

- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আলেম: উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), যিনি কুরআনের একজন বিখ্যাত কারী ও সাহাবী ছিলেন।
- গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:

- তাফসীরের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া।
- সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা।
- কুরআনের বাহ্যিক অর্থের উপর গুরুত্ব দেওয়া।
- তুলনামূলকভাবে ইজতেহাদের কম ব্যবহার।

- প্রখ্যাত আলেমগণ: যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.), আবু আল-আলিয়া (রহ.), মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাজী (রহ.) প্রমুখ।

৩. ইরাক মাযহাব (মাদ্রাসাতুল ইরাক/কূফা):

- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আলেম: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), যিনি গভীর জ্ঞান ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।
- গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
  - কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া।
  - আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর জোর দেওয়া।
  - যুক্তি ও ইজতেহাদের ব্যাপক ব্যবহার। এই মাযহাবটিকে "আহলুর রায়" (যুক্তিভিত্তিক মতামত প্রদানকারী) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।
  - কিছু ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের (আহলে কিতাব) বর্ণনা গ্রহণ, তবে সমালোচনার দৃষ্টিতে।
- প্রখ্যাত আলেমগণ: আলকামা ইবনে কায়েস (রহ.), আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহ.), মাসরুক ইবনে আল-আজদা' (রহ.), আমের আশ-শাবী (রহ.), আল-হাসান আল-বাসরী (রহ.), কাতাদা ইবনে দি'আমা আস-সাদূসী (রহ.) প্রমুখ।

এই তিনটি প্রধান মাযহাব ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইলমুত তাফসীরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে এই মাযহাবগুলোর নীতিমালা ও আলেমগণের মতামতকে কেন্দ্র করেই তাফসীরের জ্ঞান আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

٧. بين أهمية معرفة أسباب النزول في فهم آيات القرآن الكريم، واذكر بعض الأمثلة على ذلك.

কুরআনুল কারীমের আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে শানে নুযুল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট) জানার গুরুত্ব বর্ণনা কর এবং এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ কর।

কুরআনুল কারীমের আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে শানে নুযুল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট) জানার গুরুত্ব

কুরআনুল কারীমের আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে শানে নুযুল (أسباب النزول) বা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শানে নুযুল জানার মাধ্যমে আয়াতের সঠিক অর্থ, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য

এবং এর অন্তর্নিহিত হিকমত অনুধাবন করা যায়। এর গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আয়াতের সঠিক অর্থ নির্ধারণ: অনেক আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অস্পষ্ট বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাযুক্ত হতে পারে। শানে নুযুল জানার মাধ্যমে আয়াতটি কোন বিশেষ ঘটনা, প্রশ্ন বা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে তা জানা যায়, ফলে আয়াতের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা সহজ হয়। প্রেক্ষাপট না জানলে আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা থাকে।

২. আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমত ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি: শানে নুযুল আয়াত নাজিলের মূল কারণ ও উদ্দেশ্য উন্মোচন করে। কেন এই বিশেষ বিধান বা বক্তব্য আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, তা শানে নুযুল জানার মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়। ফলে আয়াতের অন্তর্নিহিত হিকমত ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

৩. সাধারণ বিধানের বিশেষ প্রেক্ষাপট জানা: অনেক আয়াত সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধান বর্ণনা করে, কিন্তু শানে নুযুল জানার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এটি মূলত কোনো বিশেষ ঘটনা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল। যদিও বিধানটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য থাকে, তবে এর প্রাথমিক প্রেক্ষাপট জানা থাকলে আয়াতের গভীরতা অনুধাবন করা যায়।

৪. নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) আয়াত নির্ধারণে সাহায্য: কোনো আয়াত পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং কোনটি পরে, তা শানে নুযুল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। এর ফলে কোন আয়াতটি রহিতকারী এবং কোনটি রহিত হয়েছে, তা বুঝতে সুবিধা হয় এবং পরস্পরবিরোধী মনে হওয়া আয়াতের সঠিক সমাধান করা যায়।

৫. আয়াতের শাব্দিক অর্থের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন: কখনো কখনো আয়াতের শাব্দিক অর্থে ব্যাপকতা থাকলেও শানে নুযুল জানার মাধ্যমে বোঝা যায় যে এটি মূলত একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য ছিল।

৬. বিরোধপূর্ণ ব্যাখ্যার নিরসন: কোনো আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা থাকলে শানে নুযুল জানার মাধ্যমে কোন ব্যাখ্যাটি সঠিক বা অধিক গ্রহণযোগ্য, তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

শানে নুযুলের কিছু উদাহরণ:

কুরআনুল কারীমের আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে শানে নুযুলের গুরুত্ব কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যাক:

উদাহরণ ১:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারা, ২:১১৫)

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থে মনে হতে পারে যে সালাতের (নামাজের) জন্য কোনো নির্দিষ্ট কেবলার (কিবলা) প্রয়োজন নেই, যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে সালাত আদায় করা যায়। কিন্তু এর শানে নুযুল

হলো, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন কিছুদিন তাঁরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। পরবর্তীতে যখন কেবলার পরিবর্তন করে কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ আসে, তখন কিছু সাহাবী দ্বিধায় পড়ে যান যে পূর্বের সালাতগুলোর কী হবে। এই প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়, যার অর্থ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুখ্য, তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই বিধান। শানে নুযুল জানার কারণে আয়াতের ব্যাপক অর্থ একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বোঝা যায়।

উদাহরণ ২:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ[1] فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ[2]

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আকাশের দিকে বারবার তাকাতে দেখি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে সেই কেবলার দিকে ফিরাব যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে মুখ ফেরাও। আর নিশ্চয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে এটাই তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আর আল্লাহ তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।" (সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৪)

এই আয়াতের শানে নুযুল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে কিবলা হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে ওহীর অপেক্ষা করছিলেন। এই প্রেক্ষাপট জানার মাধ্যমেই বোঝা যায় যে কেন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করে রাসূল (সাঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এবং কা'বাকে মুসলিমদের কিবলা নির্ধারণ করেন।

উদাহরণ ৩:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ[3] فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا[4]

"মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ করেছেন এবং আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ মুজাহিদদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মহা প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৯৫)

এই আয়াতের শানে নুযুল হলো, যখন জিহাদের নির্দেশ নাযিল হয়, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) নামক একজন অন্ধ সাহাবী বলেন যে তিনি জিহাদে যেতে অক্ষম। তখন আল্লাহ

তা'আলা এই আয়াতের "غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ" (যারা অক্ষম নয়) অংশটি নাযিল করেন, যা অক্ষম ব্যক্তিদের জিহাদে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়। শানে নুযুল জানার মাধ্যমে আয়াতের বিশেষ প্রেক্ষাপট এবং অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য শরীয়তের সহজতা উপলব্ধি করা যায়।
এভাবে অসংখ্য আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য শানে নুযুল জানা অপরিহার্য। মুফাসসিরগণ (ভাষ্যকারগণ) তাই তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযুলকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

٨. ما المقصود بالتفسير بالرأي؟ وما هي شروطه وضوابطه عند العلماء؟

তাফসীর বির রায় (বিচক্ষণতাভিত্তিক তাফসীর) বলতে কী বোঝায়? আলেমদের নিকট এর শর্তাবলী ও নীতিমালা কী কী?

তাফসীর বির রায় (التفسير بالرأي) বলতে কী বোঝায়?

"তাফসীর বির রায়" (التفسير بالرأي) আভিধানিকভাবে "নিজস্ব মতামত বা বিচক্ষণতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা" বোঝায়। ইসলামী পরিভাষায়, এটি কুরআনুল কারীমের এমন ব্যাখ্যা পদ্ধতিকে নির্দেশ করে যেখানে মুফাসসির (ভাষ্যকার) শুধুমাত্র বর্ণিত দলিলের (যেমন কুরআন, হাদীস, সাহাবা-তাবেঈনদের উক্তি) উপর নির্ভর না করে নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতা এবং শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
তবে, "রায়" শব্দটি এখানে খেয়ালখুশি, অনুমান বা ভিত্তিহীন মতামত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং এর অর্থ হলো গভীর জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও ইজতেহাদের (শরীয়তের নীতিমালার আলোকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ) মাধ্যমে কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা।

আলেমদের নিকট তাফসীর বির রায়ের শর্তাবলী ও নীতিমালা:

আলেমগণ তাফসীর বির রায়কে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেননি, তবে এর জন্য কঠোর শর্তাবলী ও নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। এই শর্তাবলী পূরণ না করলে তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী ও নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ:

১. আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞান: মুফাসসিরকে অবশ্যই আরবী ভাষার ব্যাকরণ (নাহু ও সরফ), শব্দভাণ্ডার (লুগাত), বাগধারা (মুস্তালাহাত) এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের (বালাগাহ) উপর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কুরআনের ভাষাশৈলী ও অর্থের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করার জন্য এটি অপরিহার্য।

২. শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের জ্ঞান: মুফাসসিরকে ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা (উসূলুল ফিকহ), শরীয়তের সামগ্রিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়াহ) এবং ইসলামী আইনের সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে। কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা যেন শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত নীতির বিরোধী না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩. বর্ণিত দলিলের (মাছুর) জ্ঞান: যদিও এটি রায়ভিত্তিক তাফসীর, তবুও মুফাসসিরকে কুরআন, হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈনদের বিশুদ্ধ উক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে। যদি কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট বর্ণিত দলিল থাকে, তবে নিজস্ব রায়কে তার উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। বরং বর্ণিত দলিলের আলোকে নিজস্ব বুঝকে সমন্বয় করতে হবে।

৪. পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতামতের জ্ঞান: পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরগণ কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা কিভাবে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি। তাঁদের ইজমা (ঐকমত্য) থাকলে তার বিপরীত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়। তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলে নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য মত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. সঠিক আকীদা: মুফাসসিরের আকীদা (বিশ্বাস) বিশুদ্ধ হতে হবে। কোনো ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী ব্যক্তির রায়ভিত্তিক তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তার বিশ্বাস কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

৬. নিয়ত ও আন্তরিকতা: মুফাসসিরের নিয়ত খালেস হতে হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব বা অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করা অনুচিত।

৭. প্রমাণের উপর নির্ভরতা: নিজস্ব রায় প্রদানের ক্ষেত্রে মুফাসসিরকে শক্তিশালী ভাষাগত বা যৌক্তিক প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়।

৮. তাফসীরের নীতিমালা অনুসরণ: তাফসীরের স্বীকৃত নীতিমালা (উসূলুত তাফসীর) অনুসরণ করতে হবে। যেমন - কুরআনের কোনো আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা হতে পারে, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা করে, ইত্যাদি।

৯. অস্পষ্টতা পরিহার: এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত যা সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা পরিহার করা উচিত।

১০. ভুল স্বীকার করার মানসিকতা: যদি নিজস্ব ব্যাখ্যার ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তা স্বীকার করার এবং সঠিক ব্যাখ্যা গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে।

সংক্ষেপে, তাফসীর বির রায় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়, তবে এটি কঠোর জ্ঞানগত ও методологические (পদ্ধতিগত) শর্তের সাথে যুক্ত। একজন মুফাসসির যখন গভীর জ্ঞান, শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের সঠিক বুঝ এবং বর্ণিত দলিলের আলোকে বিচক্ষণতার সাথে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তখন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে যদি কেউ শুধুমাত্র অজ্ঞতা, খেয়ালখুশি বা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করে, তবে তা নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য।

আলেমগণ এ ধরনের ব্যাখ্যাকে "তাফসীর বিল জাহল" (অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যাখ্যা) বলে অভিহিত করেন, যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

٩. اذكر بعض أشهر كتب التفسير القديمة وبين مناهج مؤلفيها بإيجاز.

প্রাচীন তাফসীরের কিছু বিখ্যাত গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে সেগুলোর লেখকদের নীতিমালা বর্ণনা কর।

প্রাচীন তাফসীরের কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ এবং সেগুলোর লেখকদের নীতিমালা সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. জামিউল বায়ান আন তা'বীল আয়িল কুরআন (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) - ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) (মৃত্যু ৩১০ হিজরী):

* নীতিমালা: এটি তাফসীর বিল মাছূরের (বর্ণনানির্ভর তাফসীর) একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। লেখক কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআন, হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈনদের উক্তি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিভিন্ন মতের মধ্যে তুলনা করেছেন এবং দলিলের ভিত্তিতে একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা এবং আয়াতের ব্যাকরণগত দিকও তাঁর তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২. মা'আলিমুত তানযীল (معالم التنزيل) - ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-ফাররা আল-বাগাভী (রহ.) (মৃত্যু ৫১৬ হিজরী):

* নীতিমালা: এটিও মূলত তাফসীর বিল মাছূরের উপর নির্ভরশীল। লেখক বিশুদ্ধ হাদীস ও সাহাবা-তাবেঈনদের নির্ভরযোগ্য উক্তি উল্লেখ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ইসরাঈলিয়্যাত (আহলে কিতাবদের থেকে আগত দুর্বল বর্ণনা) পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। তাফসীরের ভাষা সহজ ও বোধগম্য।

৩. আল-মুহাররারুল ওয়াজিজ ফী তাফসীরিল কিতাবিল আযীয (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) - আল্লামা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হাক্ক ইবনে গালিব ইবনে আতিয়্যাহ আল-আন্দালুসী (রহ.) (মৃত্যু ৫৪৬ হিজরী):

* নীতিমালা: এই তাফসীরটি মূলত ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক আলোচনার উপর গুরুত্ব দেয়। লেখক কুরআনের আয়াতের শব্দার্থ, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি সাহাবা ও তাবেঈনদের মতামতও উল্লেখ করেছেন এবং গ্রহণযোগ্য মতের সমর্থন করেছেন।

৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (تفسير القرآن العظيم) - ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমার ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী (রহ.) (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী):

* নীতিমালা: এটি তাফসীর বিল মাছূরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। লেখক কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস এবং সাহাবা-তাবেঈনদের নির্ভরযোগ্য উক্তিকে। তিনি ইসরাঈলিয়্যাত পরিহার করার চেষ্টা করেছেন এবং দুর্বল বর্ণনাগুলো চিহ্নিত করেছেন। আহকাম (আইন) সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
৫. আল-কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আকাবীল ফী উজুহুত তা'বীল (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) - আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমার আয-যামাখশারী (রহ.) (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী):
* নীতিমালা: এটি মূলত তাফসীর বির রায় (বিচক্ষণতাভিত্তিক তাফসীর) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। লেখক মু'তাযিলা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর তাফসীরে সেই প্রভাব দেখা যায়। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, বিশেষ করে ইলমুল বালাগাহ (অলঙ্কার শাস্ত্র) এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা তুলে ধরাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।
৬. মাফাতীহুল গাইব (مفاتيح الغيب) অথবা আত-তাফসীরুল কাবীর (التفسير الكبير) - ইমাম ফখরুদ-দীন আর-রাযী (রহ.) (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী):
* নীতিমালা: এটি একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ, যা মূলত তাফসীর বির রায়-এর অন্তর্ভুক্ত। লেখক বিভিন্ন দার্শনিক ও কালামী (তত্ত্ববিদ্যা) আলোচনা এনেছেন এবং বিভিন্ন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাও তাঁর তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি মূল তাফসীরের চেয়ে পার্শ্ব আলোচনায় বেশি মনোযোগ দিয়েছেন বলে সমালোচিত হন।
এই গ্রন্থগুলো প্রাচীন তাফসীরের ভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এবং পরবর্তীকালের মুফাসসিরদের জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। এদের নীতিমালা বিভিন্ন হলেও, কুরআনকে সঠিকভাবে বোঝার এবং এর জ্ঞানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

١٠. كيف ساهم التطور اللغوي والأدبي في خدمة علم التفسير؟ وضح ذلك بأمثلة.

ভাষাগত ও সাহিত্যিক উন্নয়ন কিভাবে ইলমুত তাফসীরের খেদমতে অবদান রেখেছে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

ভাষাগত ও সাহিত্যিক উন্নয়ন ইলমুত তাফসীরের খেদমতে এক বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুরআনুল কারীম আরবী ভাষার সর্বোত্তম সাহিত্যিক নিদর্শন। এর ভাষা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, অলঙ্কার এবং প্রকাশভঙ্গি এতটাই উন্নত ও অলৌকিক যে তা মানব রচিত কোনো সাহিত্যের সাথে তুলনীয় নয়। তাই কুরআনের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অপরিহার্য। ভাষাগত ও সাহিত্যিক উন্নয়নের মাধ্যমে ইলমুত তাফসীর যেভাবে উপকৃত হয়েছে, তা উদাহরণসহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. শব্দের সঠিক অর্থ নির্ধারণ:

আরবী ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা এবং একই শব্দের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে মুফাসসিরগণ কুরআনের প্রতিটি শব্দের মূল অর্থ, শাব্দিক তাৎপর্য এবং বিভিন্ন ব্যাকরণিক গঠনে তার অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পেরেছেন। অভিধান শাস্ত্রের উন্নয়ন, প্রাচীন আরবী কবিতা ও সাহিত্যের গবেষণা কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ এবং সমার্থক শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে সহায়ক হয়েছে।

উদাহরণ:

- "قُرْء" (কুরু') শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ঋতুস্রাব (মহিলাদের মাসিক) এবং পবিত্রতা উভয়ই হতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুফাসসিরগণ নির্ধারণ করেছেন যে কোন আয়াতে শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- "عَسَىٰ" (আসা) শব্দটি কুরআনে আশা ও সম্ভাবনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এর অর্থ ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবীও হতে পারে। ভাষাগত প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য দলিলের আলোকে মুফাসসিরগণ এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করেছেন।

২. ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব:

আরবী ব্যাকরণ (নাহু ও সরফ) কুরআনের বাক্য গঠন ও পদের কারক (ই'রাব) নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাকরণের সঠিক জ্ঞান ছাড়া কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মুফাসসিরগণ কুরআনের প্রতিটি বাক্যের সঠিক গঠন এবং পদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন, যা আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝতে সহায়ক হয়েছে।

উদাহরণ:

- সূরা আল-ইমরানের ৭ নং আয়াতে "الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" (যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি) - এখানে "الرَّاسِخُونَ" শব্দটি "يَقُولُونَ"-এর কর্তা (فاعل) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা জ্ঞানীদের ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ করে। ব্যাকরণগত জ্ঞানের মাধ্যমেই এই সম্পর্ক বোঝা যায়।
- বিভিন্ন আয়াতে "إِنَّ" (নিশ্চয়), "لَعَلَّ" (হয়তো), "كَانَ" (ছিল) ইত্যাদি অব্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যের অর্থে যে পরিবর্তন আসে, তা ব্যাকরণ জ্ঞানের মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব।

৩. অলঙ্কার শাস্ত্রের (বালাগাহ) অবদান:

কুরআনের ভাষাশৈলী অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ। উপমা (تشبيه), রূপক (استعارة), ইঙ্গিত (كناية), অনুপ্রাস (سجع), দ্ব্যর্থবোধক শব্দ (جناس) ইত্যাদি বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহারে কুরআনের অর্থ আরও গভীর, শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ইলমুল বালাগাহ (অলঙ্কার শাস্ত্র)-এর উন্নতির ফলে মুফাসসিরগণ

কুরআনের এই সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা উপলব্ধি করতে এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

উদাহরণ:

- সূরা আল-বাকারার ১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন: " أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ" (এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে; ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথেও আসেনি)। এখানে "গোমরাহী ক্রয়" এবং "ব্যবসা লাভজনক হয়নি" - এই রূপকগুলো মুনাফিকদের ক্ষতির গভীরতা ও স্থায়ীত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
- সূরা আল-কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" (আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল)। এখানে "وَجْهَهُ" (তাঁর মুখমণ্ডল) দ্বারা মূলত আল্লাহর সত্তা বা অস্তিত্ব বোঝানো হয়েছে - এটি একটি মাজায (রূপক) ব্যবহার।

৪. প্রাচীন আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান:

কুরআন এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে যখন আরবী ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির শিখরে ছিল। তৎকালীন আরবদের প্রবাদ, কবিতা, বাগধারা এবং সামাজিক রীতিনীতি কুরআনের অনেক আয়াতের অর্থ ও প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়ক। ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক গবেষণার মাধ্যমে মুফাসসিরগণ সেই যুগের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন, যা কুরআনের অনেক অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

উদাহরণ:

- জাহেলী যুগের আরবে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা ও বিশ্বাস কুরআনের অনেক আয়াতের প্রেক্ষাপট বুঝতে সাহায্য করে। যেমন, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া বা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের খণ্ডন কুরআনে এসেছে।
- প্রাচীন আরবী কবিতার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যবন্ধ কুরআনের ভাষারীতি বুঝতে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষাগত ও সাহিত্যিক উন্নয়ন ইলমুত তাফসীরের জন্য অপরিহার্য ভিত্তি স্থাপন করেছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান মুফাসসিরদের কুরআনুল কারীমের সঠিক, সুস্পষ্ট ও গভীর অর্থ অনুধাবন করতে এবং এর সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। এই জ্ঞানের উন্নতি অব্যাহত থাকার কারণেই যুগে যুগে কুরআনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য উন্মোচিত হচ্ছে।

مجموعة (ج)- ١٠

١. ما الفرق بين التفسير والترجمة؟ بين.

তাফসীর ও তরজমার (অনুবাদ) মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর।

তাফসীর ও তরজমার মধ্যে পার্থক্য:

তাফসীর (تفسير) এবং তরজমা (ترجمة) উভয়ই কুরআনুল কারীমকে বোঝার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হলেও, তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিচে এই পার্থক্যগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. অর্থের প্রকৃতি (طبيعة المعنى):

- তরজমা (অনুবাদ): তরজমার মূল উদ্দেশ্য হলো মূল ভাষার (আরবী) শব্দ ও বাক্যগুলোকে অন্য ভাষায় (যেমন বাংলা, ইংরেজি) সমতুল্য শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। এখানে যতটা সম্ভব আক্ষরিক অর্থের উপর জোর দেওয়া হয়, যদিও অনেক সময় ভাষাগত ভিন্নতার কারণে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব হয় না এবং ভাবানুবাদ করতে হয়। তরজমায় মূল লেখকের বক্তব্যকে অপর ভাষায় হুবহু পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
- তাফসীর (ভাষ্য): তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর অর্থ, তাৎপর্য, প্রেক্ষাপট, অন্তর্নিহিত হিকমত এবং বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। একজন মুফাসসির (ভাষ্যকার) শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (শানে নুযূল), সংশ্লিষ্ট হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈনদের মতামত, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং শরীয়তের মূলনীতির আলোকে আয়াতের গভীর অর্থ ও তাৎপর্য তুলে ধরেন।

২. ব্যাখ্যার গভীরতা (عمق التفسير):

- তরজমা (অনুবাদ): তরজমায় সাধারণত আয়াতের একটি সরল ও প্রাথমিক অর্থ প্রদান করা হয়। এটি মূল বক্তব্যকে অন্য ভাষায় বোঝার জন্য একটি ভিত্তি তৈরি করে। তরজমা কুরআনের গভীরতা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে না।
- তাফসীর (ভাষ্য): তাফসীর কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। একটি আয়াতের একাধিক সম্ভাব্য অর্থ, বিভিন্ন আলেমদের মতামত, আয়াতের বিধানাবলী এবং জীবনের সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় তাফসীরে স্থান পায়। তাফসীর পাঠককে কুরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরে নিয়ে যায়।

৩. লেখকের ভূমিকা (دور المؤلف):

- তরজমা (অনুবাদ): অনুবাদক মূলত মূল লেখকের (আল্লাহ তা'আলা) বক্তব্যকে অপর ভাষায় স্থানান্তর করেন। অনুবাদকের নিজস্ব মতামত বা ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ সীমিত থাকে। একজন ভালো অনুবাদক মূল ভাষার ভাব ও সুর অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেন।
- তাফসীর (ভাষ্য): মুফাসসির (ভাষ্যকার) কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করেন, বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং নিজস্ব জ্ঞান ও বিচক্ষণতার আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাফসীরে মুফাসসিরের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

৪. উৎসের ব্যবহার (استخدام المصادر):

- তরজমা (অনুবাদ): তরজমার ক্ষেত্রে মূল উৎস হলো কুরআনের আরবী শব্দ ও বাক্য। অনুবাদক অন্য কোনো উৎসের উপর তেমন নির্ভরশীল হন না, যদিও ভাষার জ্ঞান ও ব্যাকরণ অপরিহার্য।
- তাফসীর (ভাষ্য): তাফসীরের জন্য মুফাসসিরকে কুরআন, হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈনদের উক্তি, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, শরীয়তের মূলনীতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়।

৫. উদ্দেশ্য (الغرض):

- তরজমা (অনুবাদ): তরজমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যারা আরবী ভাষা বোঝেন না, তাদের কাছে কুরআনের মূল বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং এর প্রাথমিক অর্থ সম্পর্কে অবগত করা।
- তাফসীর (ভাষ্য): তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো কুরআনের আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উন্মোচন করা, এর বিধানাবলী ব্যাখ্যা করা এবং এর মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আলোকিত করা।

৬. অপরিবর্তনীয়তা (الثبات):

- তরজমা (অনুবাদ): কুরআনের তরজমা মানুষের বোধগম্যতার সুবিধার্থে সময়ের সাথে সাথে উন্নত ও পরিমার্জিত হতে পারে। বিভিন্ন অনুবাদক তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ করতে পারেন। তবে মূল কুরআনের মর্যাদা ও অপরিবর্তনীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে।
- তাফসীর (ভাষ্য): তাফসীর মুফাসসিরের জ্ঞান ও গবেষণার ফসল হওয়ায় বিভিন্ন মুফাসসিরের তাফসীরে ভিন্নতা দেখা যায়। তবে কুরআনের মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত থাকে।

উদাহরণ:

সূরা আল-ফাতিহার প্রথম আয়াত: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ"

- সরল অনুবাদ: "পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।" (এটি একটি আক্ষরিক ভাবানুবাদ)
- তাফসীর: এই আয়াতের তাফসীরে একজন মুফাসসির "বিসমিল্লাহ"-এর তাৎপর্য, আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নাম (আর-রাহমান ও আর-রাহীম)-এর অর্থ ও তাৎপর্য, এই আয়াতটি কুরআনের শুরুতে আসার হিকমত এবং এর ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, তরজমা হলো কুরআনের মূল বার্তা অন্য ভাষায় পৌঁছে দেওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ, যা একটি সরল ধারণা দেয়। অন্যদিকে, তাফসীর হলো কুরআনের জ্ঞানের গভীর সাগরে ডুব দেওয়া এবং এর অন্তর্নিহিত রত্নাবলী আহরণ করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা, যা একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। কুরআনকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে হলে তরজমার পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য তাফসীরের অধ্যয়ন অপরিহার্য।

٢. من هو رئيس المفسرين؟ اذكر خدماته في التفسير.

প্রধান মুফাসসির কে? তাফসীরের ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখ কর।

ঐতিহ্যগতভাবে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রধান মুফাসসির হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং একজন প্রখ্যাত সাহাবী। কুরআনের জ্ঞান ও গভীর ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাকে "হিবরুল উম্মাহ" (উম্মতের বিদ্বান) এবং "বাহরুল ইলম" (জ্ঞানের সাগর) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

তাফসীরের ক্ষেত্রে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিচে উল্লেখ করা হলো:

- কুরআনের গভীর জ্ঞান: ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআনের প্রতিটি আয়াত গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করেছিলেন যেন আল্লাহ তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন।
- সাহাবীদের থেকে জ্ঞান আহরণ: তিনি অন্যান্য প্রবীণ সাহাবীদের কাছ থেকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রেক্ষাপট, শানে নুযুল (আয়াত নাযিলের কারণ) এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন ও জ্ঞান অর্জন করতেন।
- ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান: আরবী ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং বিভিন্ন উপভাষার উপর তার অগাধ জ্ঞান ছিল, যা তাকে কুরআনের সূক্ষ্ম অর্থ বুঝতে সাহায্য করত।
- তাফসীরের মজলিস: তিনি নিয়মিতভাবে মসজিদে কুরআনের তাফসীরের মজলিস করতেন, যেখানে বহু সংখ্যক ছাত্র ও আগ্রহী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করত। তিনি বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা দিতেন এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেন।
- তাফসীর বিষয়ক উক্তি: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বহু উক্তি হাদীসের গ্রন্থগুলোতে সংরক্ষিত আছে। এগুলো পরবর্তী প্রজন্মের মুফাসসিরদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।
- তাফসীরের স্বতন্ত্র গ্রন্থের ধারণা: যদিও তার জীবদ্দশায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি, তবে তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও উক্তিগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে সন্নিবেশিত

হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআনের ব্যাখ্যাকে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালান।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরের পদ্ধতি ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবীদের উক্তি এবং আরবী ভাষার জ্ঞানভিত্তিক। তার অবদান ইসলামী জ্ঞান জগতে, বিশেষ করে তাফসীর শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন এবং এর বিকাশে এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

٣. اكتب أهمية التفسير في الحياة الانسانية.

মানব জীবনে তাফসীরের গুরুত্ব লিখ।

মানব জীবনে তাফসীরের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনুল কারীম মানবজাতির জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য তাফসীরের গুরুত্ব অপরিহার্য। নিচে মানব জীবনে তাফসীরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

- আল্লাহর পরিচয় ও মহত্ত্ব উপলব্ধি (معرفة الله وعظمته): তাফসীরের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও সৃষ্টিজগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এর ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান দৃঢ় হয় এবং তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতে মানুষ আরও বেশি মনোযোগী হয়।
- কুরআনের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন (فهم المعنى الصحيح للقرآن): কুরআন একটি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। এর প্রতিটি আয়াতের শানে নুযুল (নাযিলের প্রেক্ষাপট), ভাষাগত তাৎপর্য, আদেশ-নিষেধ এবং অন্তর্নিহিত শিক্ষা তাফসীরের মাধ্যমেই সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব। ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাফসীর অপরিহার্য।
- জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা লাভ (الحصول على الهداية في شؤون الحياة): কুরআন মানব জীবনের সকল দিক - ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক - সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তাফসীরের মাধ্যমে মানুষ এই নির্দেশনাগুলো জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে ইহ ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারে।
- নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি (الارتقاء الأخلاقي والروحي): কুরআনের উপদেশ, নীতি ও কাহিনীর মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে উৎসাহিত হয়। তাফসীর মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিশুদ্ধির পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ইসলামের জ্ঞান অর্জন (اكتساب المعرفة بالإسلام): তাফসীর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, শরীয়তের বিধি-বিধান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এর মাধ্যমে মানুষ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানতে পারে।

- সন্দেহ ও সংশয় নিরসন (دفع الشبهات والشكوك): কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে যারা সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করে, তাফসীরের মাধ্যমে তাদের ভুল ধারণা নিরসন করা সম্ভব। প্রামাণিক তাফসীর কুরআনের অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে সমালোচকদের জবাব দেয়।
- ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি (تحقيق الوحدة والتضامن): যখন মানুষ কুরআনের সঠিক অর্থ ও শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা দল-মত নির্বিশেষে একই আদর্শের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তাফসীর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে সহায়তা (المساعدة في الدعوة والتبليغ): কুরআনের মর্মার্থ সঠিকভাবে জানার মাধ্যমেই অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সুন্দর ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যায়। তাফসীর দাওয়াত কর্মীদের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান সরবরাহ করে।

পরিশেষে বলা যায়, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের সঠিক জ্ঞান ও প্রয়োগের জন্য তাফসীরের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি কেবল একটি জ্ঞান শাখা নয়, বরং মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথপ্রদর্শক।

٤. اكتب خصائص تفسير القرآن العظيم.

তাফসীরুল কুরআনিল আযীমের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

তাফসীরুল কুরআনিল আযীমের (মহিমান্বিত কুরআনের তাফসীর) অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এটিকে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

- আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা (تبيان كلام الله): তাফসীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি আল্লাহর বাণী কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। এর মাধ্যমে কুরআনের আয়াতগুলোর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, প্রেক্ষাপট, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং শিক্ষা মানুষের কাছে স্পষ্ট করা হয়।
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহর অনুসরণ (الاتباع للسنة النبوية): প্রামাণিক তাফসীর সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর আলোকে কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করে। কারণ রাসূল (সাঃ) ছিলেন কুরআনের প্রথম মুফাসসির এবং তাঁর জীবন ছিল কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন।
- সাহাবা ও তাবেঈনদের বুঝের গুরুত্ব (اعتبار فهم الصحابة والتابعين): তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবা (রাঃ) ও তাবেঈনদের (যারা সাহাবীদের অনুসরণ করেছেন) বুঝ ও ব্যাখ্যার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ তারা সরাসরি রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যে ছিলেন এবং কুরআনের নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

- ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (التحليل اللغوي): কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ। তাফসীর এর শব্দবিন্যাস, ব্যাকরণ, বাগধারা এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে আয়াতের সঠিক অর্থ উন্মোচন করে।
- শানে নুযুল ও প্রেক্ষাপট আলোচনা (بيان أسباب النزول والسياق): কুরআনের কোনো কোনো আয়াত বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। তাফসীর সেই প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) এবং পূর্বাপর আয়াতের ধারাবাহিকতা (সিয়াক ও সাবাক) আলোচনা করে আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে।
- বিভিন্ন মতের উল্লেখ ও পর্যালোচনা (ذكر الأقوال المختلفة ومناقشتها): কোনো আয়াতের একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা থাকলে প্রামাণিক তাফসীর সেগুলো উল্লেখ করে এবং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য মতটিকে প্রাধান্য দেয়।
- আকল ও যুক্তির সঠিক ব্যবহার (الاستخدام الصحيح للعقل): যদিও তাফসীরের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ, তবে শরীয়তের মূলনীতি ও সাধারণ যুক্তির আলোকে আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করার সুযোগ থাকে। তবে এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার বিপরীত কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- বিশ্বাস ও আমলের দিকনির্দেশনা (توجيهات في العقيدة والعمل): তাফসীর কেবল আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং এর মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস (আকীদাহ) পরিশুদ্ধ করা এবং দৈনন্দিন জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার দিকনির্দেশনাও প্রদান করে।
- সন্দেহ ও আপত্তির নিরসন (دفع الشبهات والاعتراضات): কুরআন সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন সন্দেহ ও আপত্তির প্রামাণিক ও যৌক্তিক জবাব তাফসীরের মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- সর্বকালের জন্য প্রাসঙ্গিকতা (الشمولية والخلود): কুরআনের শিক্ষা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। তাফসীর এই শাশ্বত বাণীকে বিভিন্ন যুগের মানুষের চাহিদা ও জিজ্ঞাসার আলোকে ব্যাখ্যা করে এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।

মোটকথা, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম হলো এক জ্ঞানগর্ভ শাখা যা কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে, এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে এবং এর সৌন্দর্য ও গভীরতা উপলব্ধি করতে অপরিহার্য। এর বৈশিষ্ট্যগুলো এটিকে মানবজাতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

٥. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المفسر المعاصر؟ وكيف يمكن التغلب عليها في ضوء المنهج العلمي للتفسير؟

একজন সমসাময়িক মুফাসসির কী কী প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন? তাফসীরের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে কিভাবে সেগুলোর মোকাবেলা করা সম্ভব?

একজন সমসাময়িক মুফাসসির (কুরআনের ব্যাখ্যাকারী) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। তাফসীরের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। নিচে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো এবং সেগুলো মোকাবেলার উপায় আলোচনা করা হলো:

সমসাময়িক মুফাসসিরের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব: বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় এই আধুনিক জ্ঞানকে কিভাবে সমন্বয় করা যায়, তা একজন মুফাসসিরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে কুরআনের আপাত বিরোধ দেখা যেতে পারে, যা নিরসনের জন্য গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন।
- বিশ্বায়নের প্রভাব ও নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপট: বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনধারা একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছে। নতুন নতুন সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কুরআনের শাশ্বত নীতিগুলো এই নতুন প্রেক্ষাপটে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা ব্যাখ্যা করা সমসাময়িক মুফাসসিরের দায়িত্ব।
- কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহার: বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি তাদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়। এই ভুল ব্যাখ্যার খণ্ডন এবং কুরআনের সঠিক মর্মার্থ তুলে ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।
- প্রাচীন তাফসীর শাস্ত্রের ঐতিহ্য রক্ষা ও আধুনিক চাহিদার সমন্বয়: তাফসীরের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাচীন মুফাসসিরগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। একজন আধুনিক মুফাসসিরকে এই ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়, আবার একই সাথে আধুনিক যুগের মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হয়। এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কঠিন হতে পারে।
- বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমালোচনা: বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের পারস্পরিক সমালোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের যৌক্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপন এবং সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দেওয়া মুফাসসিরের দায়িত্ব।
- ভাষা ও সাহিত্যশৈলীর আধুনিক বিশ্লেষণ: কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যশৈলী অত্যন্ত উন্নত ও গভীর। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনার আলোকে এর সৌন্দর্য ও তাৎপর্য তুলে ধরা একটি চ্যালেঞ্জ।

তাফসীরের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:

তাফসীরের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কুরআন ও সুন্নাহর প্রামাণিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য তথ্য ও যুক্তি ব্যবহার করে কুরআনের আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করাকে বোঝায়। এই পদ্ধতির আলোকে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব:

- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়:
    - বৈজ্ঞানিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা এবং কুরআনের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা।
    - যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও প্রমাণিত নয়, সেগুলোকে কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করা।
    - বিজ্ঞান ও কুরআনের জ্ঞানের ক্ষেত্র ভিন্ন - এই বিষয়টি উপলব্ধি করে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- বিশ্বায়ন ও নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যা:
    - কুরআনের শাশ্বত নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে আধুনিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।
    - নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি রেখে কুরআনের বিধানের প্রয়োগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।
    - বিভিন্ন সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো গ্রহণ এবং ইসলামবিরোধী দিকগুলো বর্জন করার নীতি তুলে ধরা।
- ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের খণ্ডন:
    - কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে ভুল ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ করা।
    - আলেম ও বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রামাণিক তাফসীর তৈরি ও প্রচার করা।
    - জনসাধারণের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা।
- ঐতিহ্য রক্ষা ও আধুনিক চাহিদার সমন্বয়:
    - প্রাচীন তাফসীর শাস্ত্রের মূল্যবান জ্ঞান ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকা।
    - আধুনিক যুগের মানুষের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার যৌক্তিক উত্তর প্রদান করা।
    - কুরআনের মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।
- সমালোচনার যৌক্তিক জবাব:
    - কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের জ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর উপস্থাপন করা।

- অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সমালোচনার নিরপেক্ষ ও তথ্যভিত্তিক জবাব দেওয়া।
- সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করা।

- ভাষা ও সাহিত্যশৈলীর আধুনিক বিশ্লেষণ:
  - আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনার জ্ঞান ব্যবহার করে কুরআনের ভাষার সৌন্দর্য ও গভীরতা তুলে ধরা।
  - কুরআনের অলঙ্কারশাস্ত্র, উপমা ও দৃষ্টান্তগুলোর তাৎপর্য আধুনিক পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলা।

পরিশেষে বলা যায়, একজন সমসাময়িক মুফাসসিরকে গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে হবে। তাফসীরের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তিনি যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মানবজাতির কাছে কুরআনের সঠিক পথনির্দেশনা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।

٦. بين دور السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم مع ذكر أمثلة توضيحية.

কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে সুন্নাহর ভূমিকা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে সুন্নাহর (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি) অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কুরআন বোঝার এবং এর বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সুন্নাহ হলো দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। নিচে কুরআন তাফসীরে সুন্নাহর ভূমিকা উদাহরণসহ বর্ণনা করা হলো:

কুরআন তাফসীরে সুন্নাহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা:

- কুরআনের ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণ (بيان وتفصيل مجمل القرآن): কুরআনের অনেক আয়াত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের নিয়ম সুন্নাহর মাধ্যমেই জানা যায়। যেমন, সালাত (নামাজ), সাওম (রোজা), যাকাত ও হজ্জের নিয়মকানুন কুরআনে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কিন্তু সুন্নাহ এই ইবাদতগুলোর পদ্ধতি, সময়, শর্তাবলী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে।

উদাহরণ: কুরআনে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (যেমন সূরা বাকারা: ৪৩)। কিন্তু কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে, কয় রাকাত পড়তে হবে, রুকু ও সিজদার নিয়ম কি হবে - এসব বিস্তারিতভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও বাণীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। তিনি বলেছেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।" (বুখারী: ৬৩১)

- কুরআনের নির্দিষ্টকরণ ও সীমাবদ্ধকরণ (تخصيص وتقييد عام القرآن): কুরআনের কোনো কোনো আয়াত সাধারণভাবে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু সুন্নাহর মাধ্যমে সেগুলোকে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সময় বা অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়।

উদাহরণ: কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদেরকে তালাক দাও, তারা তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।" (সূরা বাকারা: ২২৮)। এই আয়াতে সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের ইদ্দত (অপেক্ষা কাল) তিন ঋতুস্রাব বলা হয়েছে। কিন্তু সুন্নাহয় এসেছে যে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত (বুখারী: ৫৩৩২)। এখানে সুন্নাহ কুরআনের সাধারণ বিধানকে গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করেছে।

- কুরআনের বিধানের অতিরিক্ত বিধান প্রবর্তন (تشريع أحكام زائدة على ما في القرآن): সুন্নাহ কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই এমন কিছু নতুন বিধান প্রবর্তন করতে পারে, তবে তা কুরআনের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়।

উদাহরণ: কুরআনে হারাম প্রাণীদের তালিকা সংক্ষেপে এসেছে (যেমন সূরা আন'আম: ১৪৫)। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী পাখি ও ধারালো দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণীদের মাংস খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছেন (মুসলিম: ১৯৩৪)। এই বিধান সরাসরি কুরআনে উল্লেখ না থাকলেও তা কুরআনের মূলনীতি - যা ক্ষতিকর ও অপবিত্র তা হারাম - এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

- কুরআনের আয়াতের শানে নুযুল (আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট) বর্ণনা: সুন্নাহ অনেক সময় কুরআনের কোনো আয়াত কেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল তা বর্ণনা করে, যা আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝতে সহায়ক।

উদাহরণ: সূরা কাউসারের (১০৮) শানে নুযুল সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁকে "নির্বংশ" বলে উপহাস করত, তখন এই সূরা নাযিল হয় (মুসলিম: ৪০০)। এই প্রেক্ষাপট সূরাটির তাৎপর্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে প্রদত্ত অনুগ্রহ বুঝতে সাহায্য করে।

- কুরআনের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা (تفسير غريب القرآن): কুরআনের কিছু শব্দ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। সুন্নাহয় সেই শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ: কুরআনের সূরা আল-আ'লার (৮৭) প্রথম আয়াতে "সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা" এর ব্যাখ্যায় হাদীসে এসেছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করার পর "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলতেন (আবু দাউদ: ৮৮৪)। এর মাধ্যমে আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করা সহজ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনুল কারীমের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং জীবনে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য সুন্নাহর অনুসরণ অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নাহ একে অপরের পরিপূরক এবং একটিকে বাদ

দিয়ে অন্যটি সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাই তাফসীরের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো এক নির্ভরযোগ্য ও অপরিহার্য ভিত্তি।

٧. ما هي أهم القواعد الأساسية التي يعتمد عليها المفسر في فهم النص القرآني؟ اذكر ثلاثة منها مع شرح موجز لكل قاعدة.

কুরআনের পাঠ বোঝার ক্ষেত্রে মুফাসসির যেসকল গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করেন সেগুলো কী কী? সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ তিনটি উল্লেখ কর।

কুরআনের পাঠ (নস) বোঝার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসির (ভাষ্যকার) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করেন। এই নীতিগুলো তাকে কুরআনের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে। নিচে এমন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো:

১. কুরআনকে কুরআনের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা (تفسير القرآن بالقرآن): এটি তাফসীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নীতি। যখন কোনো আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত মনে হয়, তখন মুফাসসির কুরআনের অন্য আয়াতগুলোর সাহায্য নেন যেখানে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অথবা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সামগ্রিকভাবে একটি সুস্পষ্ট অর্থ তৈরি করে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একই বিষয় বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচিত হয়েছে। কোনো আয়াতে একটি নীতি সাধারণভাবে বলা হতে পারে, আবার অন্য আয়াতে তার ব্যতিক্রম বা বিশেষ দিক উল্লেখ থাকতে পারে। মুফাসসির কুরআনের সকল প্রাসঙ্গিক আয়াত একত্রিত করে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে একটি সামগ্রিক ও সুসংগত অর্থ বের করেন।

উদাহরণ: কুরআনের সূরা ফাতিহায় "সিরাত্বাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম" (তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন) বলা হয়েছে। কারা এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তা কুরআনের অন্য আয়াতে (সূরা নিসা: ৬৯) স্পষ্ট করা হয়েছে - তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ।

২. সুন্নাহর আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা (تفسير القرآن بالسنة النبوية): রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কুরআনের প্রথম ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী। কুরআনের অনেক আয়াতের অর্থ, প্রয়োগ ও বিস্তারিত বিবরণ তাঁর বাণী (হাদীস) ও কর্মের (সুন্নাহ) মাধ্যমে জানা যায়। তাই কুরআনের কোনো আয়াত বুঝতে হলে মুফাসসিরকে অবশ্যই সহীহ হাদীসের শরণাপন্ন হতে হয়।

ব্যাখ্যা: কুরআন হলো ইসলামের মূলনীতি ও দিকনির্দেশনার উৎস, আর সুন্নাহ হলো সেই নীতি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যা। কুরআনের অনেক আদেশ-নিষেধের পদ্ধতি, সময় ও শর্তাবলী সুন্নাহর মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়েছে। মুফাসসির কুরআনের আয়াতের প্রেক্ষাপট, রাসূল (সাঃ)-এর জীবনযাপন এবং তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করেন।

উদাহরণ: কুরআনে সালাত (নামাজ) কায়েম করার নির্দেশ বহুবার এসেছে, কিন্তু কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত নিয়মাবলী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।" (বুখারী: ৬৩১)

৩. সাহাবা ও তাবেঈনদের বুঝ অনুসরণ (اعتبار أقوال الصحابة والتابعين): সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন এবং কুরআনের নাযিলের সময়ের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাদের কুরআনের ব্যাখ্যা এবং তাবেঈনদের (যারা সাহাবীদের অনুসরণ করেছেন) মতামত তাফসীরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে কোনো একক সাহাবী বা তাবেঈর ভুল ব্যাখ্যার অনুসরণ করা হয় না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের গ্রহণযোগ্য মতামতের উপর নির্ভর করা হয়।

ব্যাখ্যা: সাহাবীরা ছিলেন কুরআনের প্রথম প্রজন্মের পাঠক ও বাস্তবায়নকারী। তারা রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে সরাসরি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের বুঝ অন্যদের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য। তাবেঈনরা সাহাবীদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। মুফাসসির কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবা ও তাবেঈনদের বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করেন এবং দলিলের ভিত্তিতে শক্তিশালী মতটিকে গ্রহণ করেন।

উদাহরণ: কুরআনের "আল-কালিমাতুত তাইয়্যেব" (পবিত্র বাক্য) এর ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিভিন্ন অর্থ প্রদান করেছেন, যেমন - আল্লাহর যিকির, দোয়া, শাহাদা ইত্যাদি। মুফাসসির এই সকল মতামত বিবেচনা করে আয়াতের সামগ্রিক অর্থ অনুধাবন করেন।

এই তিনটি মৌলিক নীতি ছাড়াও একজন মুফাসসিরকে আরবী ভাষার জ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, শানে নুযুল, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হয়, যা তাকে কুরআনের পাঠ সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

٨. كيف يمكن الاستفادة من العلوم اللغوية المختلفة (مثل علم الصرف والنحو والبلاغة) في خدمة تفسير القرآن؟ وضح ذلك.

কুরআনের তাফসীরের খেদমতে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান (যেমন - ইলমুস সরফ, ইলমুন নাহু, ইলমুল বালাগা) কিভাবে কাজে লাগানো যায়? তা ব্যাখ্যা কর।

কুরআনের তাফসীরের খেদমতে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান (যেমন - ইলমুস সরফ, ইলমুন নাহু, ইলমুল বালাগা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরআনের ভাষা একটি উচ্চ স্তরের সাহিত্যিক গুণাবলী সমৃদ্ধ এবং এর অর্থ অনুধাবনের জন্য এই ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান অপরিহার্য। নিচে এই জ্ঞান শাখাগুলো কিভাবে তাফসীরের ক্ষেত্রে কাজে লাগে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. ইলমুস সরফ (علم الصرف - শব্দ গঠন ও রূপান্তরের জ্ঞান):

ইলমুস সরফ হলো আরবি ভাষার শব্দ গঠন, শব্দের মূল অক্ষর, অতিরিক্ত অক্ষর, লিঙ্গ, বচন, কাল এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শব্দের রূপান্তরের জ্ঞান। কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান নিম্নলিখিতভাবে সহায়ক:

- শব্দের মূল অর্থ নির্ধারণ: ইলমুস সরফের মাধ্যমে শব্দের মূল অক্ষর (ধাতু) বের করে তার মৌলিক অর্থ জানা যায়। কুরআনের অনেক শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু মূল অর্থের জ্ঞান সঠিক তাৎপর্য নির্ধারণে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: "কিতাব" (كتاب) শব্দটি "কাতাবা" (كتب - লেখা) ধাতু থেকে এসেছে, যার মূল অর্থ হলো লিপিবদ্ধ করা বা একত্র করা। কুরআনের "কিতাব" শব্দটি শুধু পুস্তক অর্থেই নয়, বরং লিপিবদ্ধ বিধান বা একত্র করা জ্ঞান অর্থেও ব্যবহৃত হয়।
- শব্দের প্রকার ও তাৎপর্য বোঝা: ইলমুস সরফ শব্দের প্রকার (বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি) নির্ধারণ করে এবং তাদের ব্যাকরণিক কার্যকারিতা বুঝতে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: কুরআনে "আলিম" (عالم - জ্ঞানী) শব্দটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। ইলমুস সরফের জ্ঞান থাকলে বোঝা যায় এটি "আলিমা" (علم - জানা) ধাতু থেকে গঠিত একটি সক্রিয় কর্তা বা গুণবাচক বিশেষ্য, যা আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানের তাৎপর্য বহন করে।
- বিভিন্ন রূপান্তরের অর্থ অনুধাবন: একই মূল অক্ষর থেকে গঠিত বিভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। ইলমুস সরফ এই রূপান্তরগুলো বিশ্লেষণ করে আয়াতের সূক্ষ্ম অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: "গাফির" (غافر - ক্ষমাশীল), "গাফুর" (غفور - অতি ক্ষমাশীল) এবং "গাফফার" (غفار - বারবার ক্ষমাশীল) তিনটি শব্দই "গাফারা" (غفر - ক্ষমা করা) ধাতু থেকে এসেছে, কিন্তু ইলমুস সরফের জ্ঞান এই শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের তীব্রতা ও ব্যাপকতার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।

২. ইলমুন নাহু (علم النحو - বাক্য গঠন ও ব্যাকরণের জ্ঞান):

ইলমুন নাহু হলো আরবি ভাষার বাক্য গঠন, শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক, কারক, বিভক্তি এবং বাক্যের বিভিন্ন অংশের ব্যাকরণিক নিয়ম-কানুন জানার বিজ্ঞান। কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান নিম্নলিখিতভাবে সহায়ক:

- বাক্যের সঠিক অর্থ নির্ধারণ: ইলমুন নাহুর জ্ঞান বাক্যের বিভিন্ন অংশের (কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদি) পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং বাক্যের সঠিক অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। শব্দের অবস্থানে সামান্য পরিবর্তন অর্থের ভিন্নতা ঘটাতে পারে, যা ইলমুন নাহুর জ্ঞান ছাড়া বোঝা কঠিন।
    - উদাহরণ: "ইন্নাল্লাহা গফুরুর রাহীম" (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) - এখানে "গফুরুন" ও "রাহীমুন" খবর (Predicate) হিসেবে মারফু (উত্তোলিত) অবস্থায় আছে, যা আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার গুণবাচকতা বোঝাচ্ছে। ইলমুন নাহুর জ্ঞান না থাকলে শব্দের অবস্থানে ভুল করে অর্থের বিকৃতি ঘটানো সম্ভব।
- আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে বিষয়গত ও ব্যাকরণিক সম্পর্ক থাকে। ইলমুন নাহুর জ্ঞান এই সম্পর্ক নির্ধারণ করে সামগ্রিক অর্থ অনুধাবন করতে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: কুরআনের কোনো আয়াতে শর্ত (শর্তিয়া) এবং তার ফলাফল (জাযা) উল্লেখ থাকতে পারে। ইলমুন নাহুর জ্ঞান এই শর্ত ও ফলাফলের ব্যাকরণিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে এবং আয়াতের মূল বার্তা স্পষ্ট করে।
- অস্পষ্টতা দূরীকরণ: কুরআনের কোনো কোনো বাক্যে ব্যাকরণিক কারণে অস্পষ্টতা দেখা যেতে পারে। ইলমুন নাহুর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সেই অস্পষ্টতা দূর করে সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব।
    - উদাহরণ: কুরআনের সূরা নিসার ১৬২ নম্বর আয়াতে "ওয়াল মুকীমীনাস সালাতা" (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) শব্দটির ব্যাকরণিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইলমুন নাহুর জ্ঞান এই বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নির্ধারণে সাহায্য করে।

৩. ইলমুল বালাগা (علم البلاغة - অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান):

ইলমুল বালাগা হলো আরবি ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান, যা ভাষার সৌন্দর্য, প্রাঞ্জলতা এবং বক্তব্যের কার্যকরতা নিয়ে আলোচনা করে। এর প্রধান শাখাগুলো হলো:

- ইলমুল বায়ান (علم البيان - উপমা, রূপক, সাদৃশ্য): কুরআনে বিভিন্ন উপমা, রূপক ও সাদৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে যা গভীর অর্থ বহন করে। ইলমুল বায়ানের জ্ঞান এই অলঙ্কারগুলোর তাৎপর্য উন্মোচন করে আয়াতের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

- উদাহরণ: কুরআনে কাফেরদের অন্তরকে কঠিন পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে (সূরা বাকারা: ৭৪)। ইলমুল বায়ানের জ্ঞান এই উপমার অন্তর্নিহিত অর্থ - তাদের অন্তরের কাঠিন্য ও সত্য গ্রহণের অক্ষমতা - বুঝতে সাহায্য করে।

- ইলমুল বাদী' (علم البديع - শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য): কুরআনের শব্দচয়ন ও বাক্য গঠনে অসাধারণ সৌন্দর্য বিদ্যমান। ইলমুল বাদীর জ্ঞান এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে এবং আয়াতের প্রভাব ও আকর্ষণ অনুধাবন করতে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শব্দচয়নের মাধুর্য, অন্ত্যমিল এবং ধ্বনিগত ঝংকার রয়েছে যা শ্রোতাদের মনকে আকৃষ্ট করে। ইলমুল বাদীর জ্ঞান এই সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে আয়াতের শক্তিশালী প্রভাব অনুধাবন করতে সাহায্য করে।
- ইলমুল মা'আনী (علم المعاني - বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট): ইলমুল মা'আনী বক্তার উদ্দেশ্য, শ্রোতার অবস্থা এবং বক্তব্যের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারের নীতি নিয়ে আলোচনা করে। কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে।
    - উদাহরণ: কুরআনের কোনো আয়াতে প্রশ্নবোধক বাক্য থাকলে, ইলমুল মা'ানীর জ্ঞান সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য (জিজ্ঞাসা, অস্বীকৃতি, বিস্ময় ইত্যাদি) নির্ধারণ করতে সাহায্য করে এবং আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনের তাফসীরের খেদমতে ইলমুস সরফ, ইলমুন নাহু ও ইলমুল বালাগার জ্ঞান অপরিহার্য। এই ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান কুরআনের শব্দের মূল অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণিক সম্পর্ক এবং অলঙ্কারিক সৌন্দর্য অনুধাবন করে আয়াতের সঠিক ও গভীর তাৎপর্য বুঝতে মুফাসসিরকে সাহায্য করে। এই জ্ঞানের অভাব তাফসীরের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যার কারণ হতে পারে।

৭. اذكر بعض الاتجاهات الحديثة في تفسير القرآن الكريم، وبين بإيجاز أهم مميزات كل اتجاه.

কুরআনুল কারীমের তাফসীরের কিছু আধুনিক প্রবণতা উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে প্রতিটি প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে বেশ কিছু নতুন প্রবণতা দেখা যায়, যা ঐতিহ্যবাহী তাফসীর পদ্ধতির বাইরে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও জ্ঞানের আলোকে কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করে। নিচে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. বৈজ্ঞানিক তাফসীর (التفسير العلمي): এই প্রবণতায় কুরআনের আয়াতগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। এর অনুসারীরা মনে করেন যে কুরআনের অনেক আয়াতে বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

* কুরআনের আয়াতের সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাদৃশ্য স্থাপন করা।
* বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা।
* অনেক সময় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তনশীলতার কারণে দুর্বল ব্যাখ্যা দেওয়ার ঝুঁকি থাকে।

২. সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক তাফসীর (التفسير الأدبي واللغوي): এই প্রবণতা কুরআনের ভাষাশৈলী, সাহিত্যিক মান, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং ব্যাকরণিক দিকগুলোর উপর গভীরভাবে আলোকপাত করে। এর অনুসারীরা মনে করেন যে কুরআনের সৌন্দর্য ও অর্থ অনুধাবনের জন্য আরবি ভাষার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান অপরিহার্য।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

* কুরআনের সাহিত্যিক মাধুর্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশ্লেষণ।
* আয়াতের ভাষাগত সূক্ষ্মতা ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা।
* শব্দচয়ন, বাক্য গঠন এবং ছন্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

৩. সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক তাফসীর (التفسير الاجتماعي والتاريخي): এই প্রবণতায় কুরআনের আয়াতগুলোকে তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। এর অনুসারীরা মনে করেন যে কুরআনের নীতিগুলো শাশ্বত হলেও তাদের প্রয়োগ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

* কুরআনের আয়াত নাযিলের ঐতিহাসিক কারণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ।
* সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের আলোকে কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগের উপায় অনুসন্ধান।
* কুরআনের নীতিগুলোকে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নমনীয়ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা।

৪. বিষয়ভিত্তিক তাফসীর (التفسير الموضوعي): এই পদ্ধতিতে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা একই বিষয় সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

* কুরআনের বিভিন্ন অংশে একই বিষয়ের আলোচনাকে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন।
* একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করা।
* সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে কুরআনের নীতি ও দিকনির্দেশনা খুঁজে বের করা।

৫. আধুনিক দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীর (التفسير الفلسفي والمعرفي الحديث): এই প্রবণতায় আধুনিক দর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত ধারণা ও পদ্ধতির আলোকে কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

* আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে কুরআনের বার্তা বিশ্লেষণ।

* কুরআনের নীতি ও মূল্যবোধের দার্শনিক তাৎপর্য অনুসন্ধান।

* সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে কুরআনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা।

৬. নারীবাদী তাফসীর (التفسير النسوي): এই প্রবণতা কুরআনের আয়াতগুলোকে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে এবং কুরআনের সেই ব্যাখ্যাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে বলে মনে করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

* কুরআনের আয়াতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

* পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সমালোচনা ও বিকল্প নারী কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা প্রদান।

* লিঙ্গ সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ।

এগুলো কুরআনুল কারীমের তাফসীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক প্রবণতা। এই প্রবণতাগুলো ঐতিহ্যবাহী তাফসীর পদ্ধতির সাথে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং সমসাময়িক মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে এই সকল প্রবণতার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতি এবং প্রামাণিক ব্যাখ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অপরিহার্য।

١٠. ما هي الآداب التي ينبغي على المفسر أن يتحلى بها عند تفسير كلام الله تعالى؟ اذكر ثلاثة من هذه الآداب مع بيان أهميتها.

আল্লাহ তা'আলার কালামের তাফসীর করার সময় একজন মুফাসসিরের কী কী শিষ্টাচার অবলম্বন করা উচিত? গুরুত্ব বর্ণনাসহ তিনটি শিষ্টাচার উল্লেখ কর।

আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআনের তাফসীর করার সময় একজন মুফাসসিরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার (আদব) অবলম্বন করা অপরিহার্য। এই শিষ্টাচারগুলো তাফসীরের নির্ভুলতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক। নিচে গুরুত্ব বর্ণনাসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার উল্লেখ করা হলো:

১. ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া (التَّحَلِّي بِالعِلْمِ وَالحِكْمَةِ): একজন মুফাসসিরের জন্য কুরআনের ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, শানে নুযুল, হাদীস, উসূলে তাফসীর (তাফসীরের নীতিমালা) এবং শরীয়তের অন্যান্য জ্ঞান শাখায় গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি, তাকে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অধিকারী হতে হবে, যাতে তিনি আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেন এবং তা যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

গুরুত্ব: ইলম (জ্ঞান) হলো তাফসীরের ভিত্তি। পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া কুরআনের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহর কালামের মর্যাদা রক্ষার জন্য

গভীর জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। প্রজ্ঞা (হিকমাহ) মুফাসসিরকে আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে, বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আয়াতের প্রয়োগ বুঝতে সাহায্য করে।

২. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি (التَّقْوَى وَخَشْيَةُ اللهِ): মুফাসসিরকে অবশ্যই আল্লাহভীরু ও তাকওয়া অবলম্বনকারী হতে হবে। তার উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং কুরআনের সঠিক বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কোনো প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় bias বা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

গুরুত্ব: তাকওয়া মুফাসসিরকে সত্যের উপর অবিচল থাকতে এবং পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। আল্লাহভীতি তাকে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং নিজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকতে উৎসাহিত করে। আন্তরিকতা ও সততা ছাড়া আল্লাহর কালামের খেদমত সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. বিনয় ও আত্মসমালোচনা (التَّوَاضُعُ وَنَقْدُ الذَّاتِ): একজন মুফাসসিরকে বিনয়ী হতে হবে এবং কখনোই এই ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে তার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। কুরআনের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর হতে পারে এবং নতুন জ্ঞানের উন্মোচন বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আরও ভালো ব্যাখ্যা আসতে পারে। নিজের ভুল স্বীকার করার মানসিকতা এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা মুফাসসিরের জন্য জরুরি।

গুরুত্ব: বিনয় মুফাসসিরকে অন্যদের মতামত ও ব্যাখ্যাকে সম্মান করতে এবং জ্ঞানার্জনের পথে সর্বদা উন্মুক্ত থাকতে উৎসাহিত করে। আত্মসমালোচনা তাকে নিজের ভুলত্রুটিগুলো চিহ্নিত করতে এবং তা সংশোধন করতে সাহায্য করে। অহংকার ও একগুঁয়েমি জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সঠিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে বাধা সৃষ্টি করে।

এই তিনটি মৌলিক শিষ্টাচার ছাড়াও একজন মুফাসসিরের আরও কিছু আদব অবলম্বন করা উচিত, যেমন - কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা, দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভর করা, অন্যের ব্যাখ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে চিন্তা ও গবেষণা করা। এই সকল শিষ্টাচার মেনে চলার মাধ্যমেই একজন মুফাসসির আল্লাহর কালামের সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

▪ (ক) ইসলামী ইতিহাস (التاريخ الإسلامي)

▪ নবী জীবনী (السيرة النبوية)

- নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে আরবদের অবস্থা: সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পরিস্থিতি (أحوال العرب قبل مبعث النبي الحالات الاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية والأخلاقية)

❖ নবী (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে আরবদের অবস্থা:

১. সামাজিক পরিস্থিতি (الحالات الاجتماعية): গোত্রতন্ত্রের আধিপত্য ও শ্রেণী বিভাজন

নবুওয়াত পূর্ব আরব সমাজ মূলত গোত্রতান্ত্রিক কাঠামোয় বিভক্ত ছিল। প্রতিটি গোত্র স্বতন্ত্র পরিচিতি, ঐতিহ্য ও স্বার্থ ধারণ করত এবং গোত্রীয় আনুগত্য ('আসাবিয়াহ') ছিল সামাজিক সংহতির মূল ভিত্তি। এই গোত্রীয় বিভাজন প্রায়শই আন্তঃগোত্রীয় সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্ম দিত, যা সমাজে স্থায়ী অস্থিরতা সৃষ্টি করত। দুর্বল গোত্রগুলো শক্তিশালী গোত্রের দ্বারা শোষিত হতো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল।

সমাজে সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাজন বিদ্যমান ছিল। প্রভাবশালী ধনী বণিক শ্রেণী দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক শোষণ চালাত। দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং দাসদের জীবন ছিল অত্যন্ত মানবেতর। তারা কোনো প্রকার নাগরিক অধিকার ভোগ করত না এবং পশুর মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো।

নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত করুণ ও অবহেলিত। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে অপমানের চোখে দেখা হতো এবং কোনো কোনো গোত্রে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নৃশংস প্রথাও প্রচলিত ছিল। নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং তাদের মতামতকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। বহুবিবাহ এবং পুরুষের একতরফা তালাকের অধিকার নারীর নিরাপত্তাহীনতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সামগ্রিকভাবে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হতো।

২. ধর্মীয় পরিস্থিতি (الحالات الدينية): মূর্তিপূজা ও বিকৃত ধর্মীয় বিশ্বাস

নবুওয়াত পূর্ব আরবে মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কাবা শরীফসহ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং মানুষ অন্ধভাবে এদের পূজা করত। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব কুলদেবতা ছিল এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। পাথর, বৃক্ষ ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন মনে করা হতো।

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও আরবে বসবাস করত, তবে সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের মূল ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন বিকৃতি ও কুসংস্কার তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। একেশ্বরবাদের ধারণা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন প্রকার শিরক ও বিদআতে লিপ্ত ছিল।

তবে এর বিপরীতে কিছু মানুষ ছিলেন যারা ইব্রাহিম (আঃ)-এর খাঁটি একেশ্বরবাদী ধর্ম অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তারা 'হুনাফা' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সুস্পষ্ট ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করেনি।

এছাড়াও, ভবিষ্যদ্বাণী, জ্যোতিষশাস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এগুলো মানুষের ধর্মীয় চিন্তাভাবনাকে আরও বিভ্রান্ত করত।

৩. রাজনৈতিক পরিস্থিতি (الحالات السياسية): কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব ও গোত্রীয় সংঘাত

নবুওয়াত পূর্ব আরব উপদ্বীপে কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। প্রতিটি গোত্র নিজেদের এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করত এবং গোত্রীয় প্রধানদের কথাই ছিল আইন। এর ফলে আন্তঃগোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ লেগেই থাকত এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অরাজকতা বিরাজ করত।

কিছু অঞ্চলে দুর্বল রাজতন্ত্র বা শেখdoms বিদ্যমান ছিল, যেমন - হীরা ও গাসান রাজ্য, তবে তাদের প্রভাব ছিল সীমিত এবং তারা প্রায়শই পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। মক্কা মূলত কুরাইশ গোত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং কাবা শরীফের তত্ত্বাবধানের কারণে এর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, তবে এখানেও গোত্রীয় নেতৃত্ব বজায় ছিল এবং কোনো সুসংহত রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না।

সুসংগঠিত কোনো আইন ব্যবস্থা ছিল না। গোত্রীয় প্রথা ও রীতিনীতিই ছিল আইনের উৎস, যা প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্বলদের জন্য অন্যায়মূলক ছিল। শক্তিশালী গোত্রগুলো নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করত এবং দুর্বলদের অধিকার লঙ্ঘিত হতো।

৪. সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (الحالات الثقافية): সাহিত্য ও কুসংস্কারের মিশ্রণ

নবুওয়াত পূর্ব আরবরা সাহিত্য ও বাগ্মিতায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। কবিতা ছিল তাদের প্রধান সাহিত্যিক অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন মেলায় কবিরা তাদের কবিতা আবৃত্তি করতেন ও নিজেদের গোত্রের গৌরবগাঁথা তুলে ধরতেন। মুখের ভাষার প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তারা বিশুদ্ধ আরবি ভাষার চর্চা করত।
তবে তাদের সংস্কৃতি কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। শুভ-অশুভ লক্ষণ, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রকার তুকতাক তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তেমন কোনো প্রসার ছিল না। লিখন পদ্ধতির প্রচলন সীমিত ছিল এবং বেশিরভাগ জ্ঞান ও ঐতিহ্য মৌখিকভাবে বংশ পরম্পরায় চলে আসত।
তাদের মধ্যে কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিনীতি বিদ্যমান ছিল, যেমন - অতিথিপরায়ণতা, বীরত্ব ও গোত্রের সম্মান রক্ষায় দৃঢ়তা। তবে এই গুণগুলোও অনেক সময় গোত্রীয় বিদ্বেষ ও অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত থাকত।

৫. অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (الحالات الاقتصادية): ব্যবসা, পশুপালন ও শোষণ

নবুওয়াত পূর্ব আরবদের প্রধান পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন ও সামান্য কৃষি কাজ। মক্কা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র, যেখানে দূর দূরান্ত থেকে বণিকরা বাণিজ্য করতে আসতেন। ঋতুভিত্তিক বাণিজ্যিক কাফেলা (যেমন গ্রীষ্মে সিরিয়া ও শীতে ইয়েমেন) তাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল।

তবে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক লেনদেন এবং জুয়া খেলা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দিত। ধনী ব্যবসায়ীরা দরিদ্রদের শোষণ করত এবং ঋণের জালে আবদ্ধ করত।

লুটপাট ও রাহাজানি দুর্বল গোত্র বা কাফেলার উপর হামলা করে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া একটি সাধারণ ঘটনা ছিল এবং এটিকে অনেক সময় বীরত্বের পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা হতো। কৃষি কাজের প্রসার সীমিত ছিল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও জলের অভাবের কারণে।

৬. নৈতিক পরিস্থিতি (الحالات الأخلاقية): অবক্ষয় ও কিছু ব্যতিক্রম

নবুওয়াত পূর্ব আরব সমাজে নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মিথ্যাচার, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ, দুর্বলদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি নৈতিক দুর্বলতা সাধারণ চিত্র ছিল। মাদকাসক্তি (বিশেষত মদ্যপান) এবং জুয়া খেলা ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিল।

তবে এর বিপরীতে তাদের মধ্যে কিছু ভালো গুণও বিদ্যমান ছিল, যেমন - অতিথিপরায়ণতা, বীরত্ব, দানশীলতা এবং গোত্রের সম্মান রক্ষায় দৃঢ়তা। কিন্তু এই গুণগুলোও অনেক সময় গোত্রীয় বিদ্বেষ ও অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত থাকত এবং সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ছিল।

সামগ্রিকভাবে, নবুওয়াত পূর্ব আরব সমাজ একটি অন্ধকার যুগ অতিক্রম করছিল, যেখানে সামাজিক অবিচার, ধর্মীয় কুসংস্কার, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, অর্থনৈতিক শোষণ এবং নৈতিক অবক্ষয় বিদ্যমান ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটে এবং ইসলাম এক আলোকবর্তিকা হিসেবে আরব সমাজকে নতুন পথের দিশা দেয়।

○ নবী (ﷺ)-এর মক্কী জীবন (الحياة المكية للنبي (ﷺ))

নবী (ﷺ)-এর মক্কী জীবন:

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবীর "নবী জীবনী: ঘটনাবলীর উপস্থাপন ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ" গ্রন্থে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মক্কী জীবন (নবুওয়াত লাভের পর থেকে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ের ঘটনাবলী, দাওয়াতের পর্যায়, কুরাইশদের বিরোধিতা এবং মুসলিমদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। নিচে মক্কী জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. নবুওয়াত লাভ ও প্রাথমিক দাওয়াত (الوحي وبداية الدعوة):

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় প্রথম ওহী লাভ করেন। ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইকরা' (পড়) - এই নির্দেশ নিয়ে আসেন। এই ঘটনা নবীজির (ﷺ) জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং তিনি নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত হন।

প্রথম পর্যায়ে নবীজি (ﷺ) গোপনে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। এই আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ), বন্ধু আবু বকর (রাঃ), চাচাতো ভাই আলী (রাঃ) এবং পোষ্য যায়েদ বিন

হারেসা (রাঃ)। ধীরে ধীরে আরও কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবার ইয়াসির (রাঃ) ও সুমাইয়া (রাঃ) প্রমুখ। এই প্রাথমিক মুসলিম জামাত দারুল আরকামে একত্রিত হয়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতেন এবং গোপনে ইবাদত করতেন।

এই গোপন দাওয়াতের পর্যায়ে নবীজি (ﷺ) অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেন এবং তাদের কাছে ইসলামেরmessage তুলে ধরেন। এই সময়ের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল একত্ববাদ (তাওহীদ), আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন এবং মূর্তিপূজার প্রত্যাখ্যান।

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত ও কুরাইশদের বিরোধিতা (الجهر بالدعوة ومعارضة قريش):

আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কার জনগণকে একত্রিত করে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানান এবং মূর্তিপূজার নিন্দা করেন। এই প্রকাশ্যে দাওয়াত কুরাইশদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কুরাইশদের বিরোধিতার প্রধান কারণগুলো ছিল:

- পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য: তারা তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও প্রথা ত্যাগ করতে রাজি ছিল না।
- সামাজিক নেতৃত্ব হারানোর ভয়: কুরাইশরা কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সমাজে যে সম্মান ও নেতৃত্ব ভোগ করত, তারা আশঙ্কা করত ইসলাম গ্রহণের ফলে তা হ্রাস পাবে।
- অর্থনৈতিক স্বার্থ: মূর্তিপূজার মাধ্যমে তাদের যে আয় হতো, তা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
- একেশ্বরবাদের প্রতি অবিশ্বাস: তারা বহু দেব-দেবীর পূজায় অভ্যস্ত ছিল এবং এক আল্লাহর ধারণাকে সহজে মেনে নিতে পারছিল না।
- গোত্রীয় অহংকার: তারা মনে করত তাদের গোত্রের একজন ব্যক্তি কিভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে ভুল প্রমাণ করতে পারে।

কুরাইশরা বিভিন্নভাবে নবীজির (ﷺ) দাওয়াতকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা কটূক্তি, উপহাস, মিথ্যা অপবাদ ও সামাজিক বয়কট এর মতো手段 অবলম্বন করে। নবীজি (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।

৩. নির্যাতন ও ধৈর্য (الاضطهاد والصبر):

মক্কী জীবনে মুসলিমদের উপর অকথ্য নির্যাতন নেমে আসে। দুর্বল মুসলিম দাস ও সাধারণ মানুষদের উপর কুরাইশরা নির্মম অত্যাচার চালায়। বেলাল (রাঃ) কে উত্তপ্ত পাথরের উপর শুইয়ে নির্যাতন করা হয়, আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবার ইয়াসির (রাঃ) ও সুমাইয়া (রাঃ) কঠিন কষ্টের শিকার হন (সুমাইয়া (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ)।

নবীজি (ﷺ) নিজেও কুরাইশদের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের শিকার হন। তাঁর পথে কাঁটা বিছানো হতো, তাঁর গায়ে উটের নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করা হতো এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে অপমান করা হতো।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে নবীজি (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীরা অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তারা আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা রাখেন এবং নিজেদের ঈমানের উপর অটল থাকেন। নবীজি (ﷺ) সাহাবীদের সবর ও ত্যাগের শিক্ষা দেন এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আশাবাদী থাকার encouragement দেন।
কিছু মুসলিম নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত নামে পরিচিত। আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে তারা আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানে নিরাপদে দ্বীনের চর্চা করতে সক্ষম হন।

৪. গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (أحداث هامة):

মক্কী জীবনে ইসলামের ইতিহাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়, যা দাওয়াতের গতিপথ পরিবর্তন করে:

- হামজা (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ: নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এবং প্রভাবশালী উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ মক্কায় মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কুরাইশদের উপর কিছুটা হলেও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।
- তায়েফের সফর: নবুওয়াতের দশম বছরে নবীজি (ﷺ) মক্কার বাইরে তায়েফে ইসলামের দাওয়াত দিতে যান, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে আহত করে। এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখা যায়।
- ইসরা ও মিরাজ: নবুওয়াতের দশম বছরে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে (ﷺ) মেরাজে নিয়ে যান। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করেন এবং ঊর্ধ্বাকাশে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন ও বিভিন্ন নিদর্শন দেখেন। এই অলৌকিক ঘটনা মুসলিমদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করে এবং নবীজির (ﷺ) মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
- আকাবার শপথ: মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক হজে এসে গোপনে নবীজির (ﷺ) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে মদীনায় আসার আমন্ত্রণ জানান। এটি প্রথম আকাবার শপথ নামে পরিচিত। পরের বছর আরও বেশি সংখ্যক লোক এসে নবীজির (ﷺ) হাতে শপথ নেন, যা দ্বিতীয় আকাবার শপথ নামে পরিচিত। এই শপথ হিজরতের পটভূমি তৈরি করে।

৫. মক্কী জীবনের শিক্ষা (دروس من الحياة المكية):

নবীজির (ﷺ) মক্কী জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য বহু মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছে:

- একত্ববাদের প্রচার ও শিরকের মূলোৎপাটনের গুরুত্ব: ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা অপরিহার্য।
- বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা রাখা: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতাশ না হয়ে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রাখা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।
- দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও কৌশলের অবলম্বন: পরিস্থিতি ও مخاطب অনুযায়ী দাওয়াতের পদ্ধতি নির্ধারণ করা জরুরি।

- সংগঠিতভাবে দ্বীনের পথে সংগ্রাম করা: জামাতবদ্ধ জীবনযাপন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বীনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করা: সকল প্রকার ভয় ও শঙ্কাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা।
- ত্যাগের মহিমা ও কুরবানীর গুরুত্ব: দ্বীনের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করার মানসিকতা তৈরি করা।

মক্কী জীবন ছিল ইসলামের বীজ বপনের সময়কাল। এই সময়ে মুসলিমরা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং তাদের ঈমানকে মজবুত করেছেন। এই সময়ের ঘটনাবলী পরবর্তী মাদানী জীবনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মক্কী জীবনের প্রতিটি দিক গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং এর শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

○ মাদানী জীবন (الحياة المدنية)

❖ নবী (ﷺ)-এর মাদানী জীবন:

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবীর "নবী জীবনী: ঘটনাবলীর উপস্থাপন ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ" গ্রন্থে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মাদানী জীবন (মদীনায় হিজরত থেকে শুরু করে তাঁর ওফাত পর্যন্ত প্রায় দশ বছর) ইসলামী ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মাদানী জীবনের প্রতিটি দিক গভীরভাবে অনুধাবন করা অপরিহার্য। নিচে মাদানী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১. হিজরত ও মদীনায় আগমন (الهجرة والقدوم إلى المدينة):

কুরাইশদের অব্যাহত নির্যাতন ও হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। এই হিজরত ইসলামী ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

মদীনার লোকেরা (আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলিমরা, যারা আনসার নামে পরিচিত) আন্তরিকভাবে মুহাজিরদের (মক্কা থেকে আগত মুসলিম) স্বাগত জানান এবং তাদের আশ্রয় ও সাহায্য করেন। হিজরতের পর নবীজি (ﷺ) মদীনার ইয়াসরিব নামক পুরাতন নাম পরিবর্তন করে 'মদীনা মুনাওয়ারা' (আলোকময় শহর) নামকরণ করেন।

মদীনায় আগমনের পর নবীজি (ﷺ) সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করেন, যা শুধু ইবাদতের স্থানই ছিল না, বরং ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র, শিক্ষা ও আলোচনার প্রাণকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন (মুওয়াখাত) স্থাপন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গোত্রীয় বিদ্বেষ দূর করতে এবং একটি unified মুসলিম সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা (تأسيس الدولة الإسلامية):

মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুসংগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভিত্তি ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং নবীজির (ﷺ) নেতৃত্ব। তিনি মদীনার সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের (মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য) মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন, যা 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। এই সনদ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি মদীনার নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের নীতি, নিরাপত্তা ও বিচার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এই রাষ্ট্রের প্রধান, আইন প্রণেতা, বিচারক ও সামরিক নেতা। তিনি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতেন। মদীনার সনদ বহুধর্মীয় সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার (الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية):

মদীনায় নবীজি (ﷺ) একটি ন্যায়ভিত্তিক ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার করেন:

- যাকাত প্রবর্তন: যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হয়, যা দরিদ্র ও অভাবী মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং সম্পদ বণ্টনে ভারসাম্য রক্ষা করে।
- সুদ নিষিদ্ধকরণ: সুদভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয় এবং হালাল ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করা হয়, যা অর্থনৈতিক শোষণ কমাতে সহায়ক হয়।
- দাসপ্রথা বিলোপের gradual প্রক্রিয়া: যদিও তাৎক্ষণিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হয়নি, তবে এর নিষ্ঠুরতা কমিয়ে আনা হয় এবং দাসমুক্তির বিভিন্ন উপায় (যেমন কাফফারা) নির্ধারণ করা হয়।
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা: ইসলাম নারীদের সম্মানজনক মর্যাদা দান করে এবং তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকারসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে।
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: জাতি, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান বিচার নিশ্চিত করা হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মাদকদ্রব্য ও জুয়া নিষিদ্ধকরণ: সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মাদকদ্রব্য ও জুয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়।

৪. রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাত (الصراعات السياسية والعسكرية):

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ হয় এবং তারা মদীনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ শুরু করে। এই সময়কালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান সংঘটিত হয়:

- বদর যুদ্ধ (২ হিজরী): কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত এই যুদ্ধে মুসলিমদের অভাবনীয় বিজয় ইসলামের শক্তি ও আল্লাহর সাহায্যের প্রমাণ বহন করে।

- উহুদ যুদ্ধ (৩ হিজরী): বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশদের মদীনার উপর আক্রমণ। মুসলিমদের জন্য এটি একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল এবং রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নির্দেশের সামান্য অবহেলা ক্ষতির কারণ হয়।
- খন্দকের যুদ্ধ (আহযাবের যুদ্ধ) (৫ হিজরী): মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্র এবং মদীনার ইহুদিদের সম্মিলিত আক্রমণ। সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শে পরিখা খনন মুসলিমদের সফল প্রতিরক্ষায় সহায়ক হয়।
- হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ হিজরী): মক্কার কুরাইশদের সাথে সম্পাদিত এই সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য কিছুটা প্রতিকূল মনে হলেও, এটি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- খায়বারের যুদ্ধ (৭ হিজরী): মদীনার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শক্তিশালী ইহুদি বসতি খায়বারের পতন মুসলিমদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে।
- মক্কা বিজয় (৮ হিজরী): হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয়। এটি ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে গণ্য হয়।
- হুনাইনের যুদ্ধ (৮ হিজরী): মক্কা বিজয়ের পর কিছু আরব গোত্রের বিদ্রোহ। প্রথমে মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জিত হয়।
- ছোট অভিযান (সারিয়্যা): বিভিন্ন ছোট ছোট সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো।

৫. ইসলামের বিস্তার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (انتشار الإسلام والعلاقات الدولية):

মদীনা থেকে ইসলামের দাওয়াত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলামের প্রচার আরও দ্রুত হয় এবং বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়।

নবীজি (ﷺ) বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও গোত্রের rulers দের কাছে ইসলামের দাওয়াতপত্র প্রেরণ করেন। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের পরিচিতি লাভ করে। তিনি বিভিন্ন গোত্রের সাথে চুক্তি ও মৈত্রী স্থাপন করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেন।

কামিল পরীক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক: মদীনায় ইসলামের প্রসারের কারণ ও পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে নবীজির (ﷺ) সম্পর্ক ও চুক্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি।

৬. আইন ও শরীয়তের প্রবর্তন (تشريع الشريعة):

মাদানী জীবনে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান নাজিল হয় এবং তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা শুরু হয়। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এর মতো মৌলিক ইবাদতের নিয়মকানুন সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত

হয়। পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন, ফৌজদারি আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ ছিল ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস।

৭. নবী (ﷺ)-এর নেতৃত্ব ও আদর্শ (قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وأسوة الحسنة):

মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বিচক্ষণ সেনাপতি, ন্যায়পরায়ণ বিচারক, দক্ষ কূটনীতিক ও মহান সংস্কারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমাশীলতা এবং জনগণের প্রতি ভালোবাসা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়ন করে মুসলিমদের জন্য উত্তম আদর্শ (উসওয়া হাসানা) স্থাপন করেন।

৮. বিদায় হজ ও ওফাত (حجة الوداع والوفاة):

দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে প্রথম ও শেষ হজ পালিত হয়, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ইসলামের মৌলিক নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হন এবং অবশেষে মদীনায় তাঁর তিরোধান হয়। তাঁর ওফাতের মাধ্যমে নবুওয়তের সমাপ্তি ঘটে, তবে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন পথপ্রদর্শক হিসেবে বিদ্যমান থাকে।

মাদানী জীবন ছিল ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন ও একটি আদর্শ সমাজ গঠনের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে ইসলাম শুধু একটি ধর্ম হিসেবেই নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর প্রভাব আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে। কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মাদানী জীবনের প্রতিটি দিক গভীরভাবে অধ্যয়ন করা এবং এর শিক্ষা অনুধাবন করা অপরিহার্য।

○ যুদ্ধ, ছোট অভিযান ও বিজয়সমূহ (الغزوات والسرايا والفتوحات)

❖ যুদ্ধ, ছোট অভিযান ও বিজয়সমূহ:

ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবীর "নবী জীবনী: ঘটনাবলীর উপস্থাপন ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ" গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধ (গাযওয়া), ছোট অভিযান (সারিয়্যা) ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয় (ফাতহ) ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী, তাদের প্রেক্ষাপট, কারণ, ফলাফল এবং ইসলামী শরীয়তের আলোকে তাৎপর্য অনুধাবন করা অপরিহার্য। নিচে এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. গাযওয়া (الغزوات): রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বাধীন যুদ্ধসমূহ

'গাযওয়া' সেই সকল যুদ্ধ বা সামরিক অভিযানকে বোঝায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, গাযওয়ার সংখ্যা ২৭টি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়, তবে সবগুলোতে সরাসরি যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

- **বদর যুদ্ধ (২ হিজরী):**
  - কারণ: কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাধা দান এবং মক্কার মুসলিমদের ফেলে আসা সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে আসা কাফেলাকে রক্ষা করতে মক্কার বিশাল সৈন্যবাহিনীর আগমন।
  - ঘটনা: স্বল্প সংখ্যক (৩১৩ জন) মুসলিম সৈন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় এক হাজার কুরাইশ সৈন্যের মোকাবিলা করে আল্লাহর সাহায্য ও অসাধারণ বীরত্বের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেন।
  - ফলাফল ও তাৎপর্য: এটি ছিল ইসলামের প্রথম সশস্ত্র সংঘাত এবং মুসলিমদের জন্য এক অভাবনীয় বিজয়। এই বিজয় মুসলিমদের মনোবল বৃদ্ধি করে, ইসলামের শক্তি প্রমাণ করে এবং মদীনার নবগঠিত রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। বদরের যুদ্ধ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়।
  - ইসলামী শরীয়তের আলোকে শিক্ষা: আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা, অল্প সংখ্যক মুজাহিদের দৃঢ় ঈমান ও আনুগত্য, পরামর্শের গুরুত্ব এবং যুদ্ধবন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ।
- **উহুদ যুদ্ধ (৩ হিজরী):**
  - কারণ: বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার কুরাইশ সৈন্যের মদীনার উপর আক্রমণ।
  - ঘটনা: মুসলিমরা প্রথমে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেও, কিছু তীরন্দাজের রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নির্দেশ অমান্য করার কারণে বিপর্যয় ঘটে এবং মুসলিমরা সাময়িক ক্ষতির শিকার হন। স্বয়ং নবীজি (ﷺ) আহত হন এবং অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।
  - ফলাফল ও তাৎপর্য: এটি মুসলিমদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল। এই পরাজয় থেকে মুসলিমরা নেতার আনুগত্যের গুরুত্ব, যুদ্ধের নিয়ম মেনে চলার অপরিহার্যতা এবং আত্ম-পর্যালোচনার শিক্ষা লাভ করেন।
  - ইসলামী শরীয়তের আলোকে শিক্ষা: নেতার আনুগত্যের গুরুত্ব, শৃঙ্খলা রক্ষার অপরিহার্যতা, পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া।
- **খন্দকের যুদ্ধ (আহযাবের যুদ্ধ) (৫ হিজরী):**
  - কারণ: মক্কার কুরাইশ, অন্যান্য আরব গোত্র এবং মদীনার ইহুদিদের সম্মিলিত (প্রায় দশ হাজার) সৈন্যের মদীনার উপর আক্রমণ।
  - ঘটনা: সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শে মদীনার চারপাশে পরিখা (খন্দক) খনন করা হয়, যা শত্রুদের অগ্রগতি ব্যাহত করে। দীর্ঘ অবরোধের পর তীব্র বাতাস ও আল্লাহর বিশেষ সাহায্য শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেয় এবং তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।
  - ফলাফল ও তাৎপর্য: মুসলিমদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিরক্ষামূলক কৌশল বিজয় এনে দেয়। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট, যেখানে শত্রুদের সম্মিলিত শক্তি পরাজিত হয়।

- ইসলামী শরীয়তের আলোকে শিক্ষা: পরামর্শের গুরুত্ব, উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বন, সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল।

- **খায়বারের যুদ্ধ (৭ হিজরী):**
  - কারণ: মদীনার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শক্তিশালী ইহুদি বসতি খায়বার ছিল মুসলিমদের জন্য একটি হুমকি এবং তারা কুরাইশ ও অন্যান্য শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।
  - ঘটনা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীদের নিয়ে খায়বারের দিকে অগ্রসর হন এবং বেশ কয়েকটি দুর্গ অবরোধের পর মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন।
  - ফলাফল ও তাৎপর্য: খায়বারের পতন মুসলিমদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মদীনার উত্তর দিক থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
  - ইসলামী শরীয়তের আলোকে শিক্ষা: শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা, প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা এবং বিজিতদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা।
- **মক্কা বিজয় (৮ হিজরী):**
  - কারণ: হুদায়বিয়ার সন্ধি কুরাইশদের দ্বারা লঙ্ঘিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দশ হাজার সাহাবীর বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন।
  - ঘটনা: বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবা শরীফ থেকে ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ করেন এবং মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।
  - ফলাফল ও তাৎপর্য: এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত বিজয়। মক্কা ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।
  - ইসলামী শরীয়তের আলোকে শিক্ষা: বিজয়ের পর প্রতিশোধ পরিহার করে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া, শত্রুদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।
- **হুনাইনের যুদ্ধ (৮ হিজরী):**
  - কারণ: মক্কা বিজয়ের পর কিছু শক্তিশালী আরব গোত্র (যেমন হাওয়াযিন ও সাকীফ) মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়।
  - ঘটনা: প্রথমে মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের অহংকার ক্ষতির কারণ হলেও, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) দৃঢ় নেতৃত্ব ও সাহাবীদের বীরত্বের ফলে শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন।
  - ফলাফল ও তাৎপর্য: এই যুদ্ধ আরব উপদ্বীপে মুসলিমদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং অবশিষ্ট বিদ্রোহী গোত্রগুলোর শক্তি ভেঙে দেয়।
  - ইসলামী শরীয়তের আলোকে শিক্ষা: শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা, কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নেতার আনুগত্য করা।

২. সারিয়্যা (السرايا): রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কর্তৃক প্রেরিত ছোট অভিযানসমূহ

'সারিয়্যা' সেই সকল ছোট সামরিক অভিযানকে বোঝায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি, বরং সাহাবীদের নেতৃত্বে ছোট ছোট দল প্রেরণ করেছিলেন। এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:

- গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ: শত্রুদের গতিবিধি ও পরিকল্পনার খবর নেওয়া।
- পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো: বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের বার্তা বহন করা।
- মদীনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: সম্ভাব্য হুমকি দমন করা এবং বাণিজ্য পথ নিরাপদ রাখা।
- শত্রুদের মনোবল দুর্বল করা: আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে তাদের ভীত রাখা।

অনেকগুলো সারিয়্যা সংঘটিত হয়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে অভিযান, উবাইদা বিন আল-হারিসের নেতৃত্বে অভিযান, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে অভিযান ইত্যাদি। এই ছোট অভিযানগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপত্তা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. ফুতুহাত (الفتوحات): গুরুত্বপূর্ণ বিজয়সমূহ

'ফুতুহাত' শব্দটি সাধারণত বড় ধরনের বিজয় বা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বিজিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাতহ ছিল মক্কা বিজয় (ফাতহ মক্কা)। এই বিজয় শুধু একটি শহরের দখল ছিল না, বরং এটি ছিল ইসলামের আদর্শের বিজয় এবং আরব উপদ্বীপে মুসলিমদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা।

❖ **মক্কা বিজয়ের বিশেষ তাৎপর্য হলো:**

- বিনা রক্তপাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র জয়।
- কাবা শরীফ মূর্তিমুক্তকরণ এবং আল্লাহর ঘর হিসেবে এর মর্যাদা পুনরুদ্ধার।
- শত্রুদের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন, যা বহু মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।
- আরব উপদ্বীপের অন্যান্য গোত্রগুলোর উপর মুসলিমদের প্রভাব বিস্তার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সংঘটিত এই যুদ্ধ, ছোট অভিযান ও বিজয়সমূহ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন, ইসলামের বিস্তার এবং মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধিতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনাবলী ইসলামী শরীয়তের যুদ্ধনীতি, ন্যায়বিচার, ক্ষমা ও সাহসিকতার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে, যা কামিল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি।

▪ খলীফাদের ইতিহাস-সুয়ূতী (السيوطي: تاريخ الخلفاء)

- খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)-(عهد الخلفاء الراشدين (٦٣٢-٦٦١

❖ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

এই যুগটি শুধু ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ই নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় আদর্শের উৎস। এই সময়ে চারজন মহান খলীফা নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রেখে যাওয়া রিসালাতের পতাকা সমুন্নত রাখেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তাঁদের সম্মিলিত শাসনকাল খোলাফায়ে রাশেদীন নামে খ্যাত।

১. আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা এবং নবী (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। তাঁর খিলাফতকাল ছিল প্রায় দুই বছর, তবে এই স্বল্প সময়ে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন এবং বহু কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন।

- **খিলাফত লাভ ও বায়আত (الخلافة والبيعة):** নবী (সাঃ)-এর আকস্মিক ওফাতের পর মুসলিম সমাজে নেতৃত্ব নিয়ে একটি সংকট তৈরি হয়। আনসার সাহাবীরা মদীনার স্থানীয় নেতৃত্ব ধরে রাখার পক্ষে মত দেন, অন্যদিকে মুহাজির সাহাবীরা মক্কার ঐতিহ্য এবং নবীর (সাঃ) সাহচর্যের কারণে নিজেদের নেতৃত্বের দাবি করেন। এই পরিস্থিতিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর দৃঢ় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর মর্যাদা, ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ এবং নবীর (সাঃ) আস্থাভাজন হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। মসজিদে নববীতে এক ঐতিহাসিক সমাবেশে উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন, এরপর অন্যান্য মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণও তাঁকে বায়আত প্রদান করেন। এই বায়আত ইসলামী রাষ্ট্রের ঐক্য এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল। আবু বকর (রাঃ)-এর নির্বাচন শুরাভিত্তিক পরামর্শের গুরুত্ব এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মতির তাৎপর্য তুলে ধরে।
- **রিদ্দার যুদ্ধ (حروب الردة) - ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ দমন:** আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রিদ্দার যুদ্ধ। নবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিছু গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে (রিদ্দা), যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব হয়, যারা মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে আবু বকর (রাঃ) কঠোর ও আপোষহীন নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভের সাথে কোনো আপোষ করা হবে না এবং ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর অসাধারণ সামরিক নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন ফ্রন্টে বিদ্রোহীদের পরাজিত করে। এই যুদ্ধগুলোতে ইয়ামামার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে বহু হাফেজ সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। রিদ্দার যুদ্ধে আবু বকর (রাঃ)-এর দৃঢ়তা ইসলামী রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করে এবং প্রমাণ করে যে ইসলামের মূলনীতিতে কোনো দুর্বলতা নেই।
- **কুরআন সংকলনের প্রাথমিক উদ্যোগ (جمع القرآن):** রিদ্দার যুদ্ধের বিশেষ করে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজ সাহাবীর শাহাদাত বরণের ফলে কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে কুরআনের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব দেন। প্রথমে আবু বকর (রাঃ) দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কারণ নবী (সাঃ) স্বয়ং এই কাজটি করেননি। তবে উমর (রাঃ)-এর যুক্তির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তিনি যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ)-কে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদের সহায়তায় কুরআনের বিভিন্ন লিখিত অংশ, চামড়ার টুকরা, খেজুর পাতা এবং হাফেজদের স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করার কাজ শুরু করেন। যদিও এই সময়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতের কুরআন সংকলনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে।

- **প্রশাসন ও নীতি (الإدارة والسياسة):** আবু বকর (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও পরামর্শমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অভিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি দুর্বল ও অসহায়দের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ন্যায্যভাবে বিতরণের নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালনে সর্বদা আল্লাহর ভয় এবং জনগণের কল্যাণকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং ইসলামের প্রতি অবিচল আনুগত্য মুসলিম শাসকদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

২. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা এবং তাঁর দশ বছরের শাসনকাল ইসলামী ইতিহাসের এক বিপ্লবী অধ্যায়। তাঁর বিচক্ষণতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতা তাঁকে ইতিহাসে এক অনন্য স্থান দিয়েছে।

- **খিলাফত লাভ (تولي الخلافة):** আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে উমর (রাঃ)-কে তাঁর successor মনোনীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধিকাংশ সাহাবী উমর (রাঃ)-এর যোগ্যতা, দৃঢ়তা এবং ইসলামের প্রতি গভীর জ্ঞান ও আনুগত্যের কারণে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। আবু বকর (রাঃ)-এর ওফাতের পর সর্বসম্মতিক্রমে উমর (রাঃ) খলীফা হিসেবে বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফত লাভ ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

- **বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার (الفتوحات الإسلامية الكبرى):** উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের অভাবনীয় বিস্তার ঘটে। তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, দক্ষ সামরিক নেতৃত্ব এবং যোগ্য সেনাপতিদের কারণে মুসলিম বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যেই পারস্য, সিরিয়া, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে। ইয়ারমুকের যুদ্ধ (সিরিয়া বিজয়), কাদিসিয়ার যুদ্ধ (পারস্য বিজয়) এবং নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ (পারস্যের চূড়ান্ত বিজয়) ছিল এই সামরিক সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বিজয়ের ফলে ইসলাম একটি আঞ্চলিক শক্তি থেকে বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

- **প্রশাসনিক সংস্কার (الإصلاحات الإدارية):** উমর (রাঃ) বিজিত অঞ্চলগুলোর সুষ্ঠু শাসনের জন্য এক সুসংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি প্রদেশভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য গভর্নর (আমির) নিয়োগ করেন। প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য 'দিওয়ান' (সামরিক ও আর্থিক দপ্তর) প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হতো এবং সৈন্যদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করা হতো। জনগণের কল্যাণে তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করেন, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য ভাতা নির্ধারণ এবং পথিকদের জন্য সরাইখানা স্থাপন। বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হয় এবং যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ কাজী (বিচারক) নিয়োগ করা হয়। 'হিজরী' চান্দ্রবর্ষের প্রবর্তন তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার, যা মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্যালেন্ডার তৈরি করে।

- **ইনসাফ ও ন্যায়বিচার (العدل والإنصاف):** উমর (রাঃ)-এর শাসনকালে ন্যায়বিচার সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করে। তিনি শাসক ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না এবং সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করতেন। তাঁর কঠোর ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রজাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ইতিহাসে কিংবদন্তী তুল্য। কথিত আছে, তিনি রাতের বেলা ছদ্মবেশে ঘুরে প্রজাদের অভাব-অভিযোগের খোঁজ নিতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর ন্যায়বিচারের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, যা মুসলিম শাসকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

৩. উসমান ইবনুল আফফান (রাঃ) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

উসমান ইবনুল আফফান (রাঃ) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলীফা এবং তাঁর বারো বছরের শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়।

- **খিলাফত লাভ (تولي الخلافة):** উমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে ছয় সদস্যের একটি নির্বাচনী পরিষদ (শুরা) গঠন করে যান, যাদের মধ্য থেকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। এই পরিষদে দীর্ঘ আলোচনার পর উসমান ইবনুল আফফান (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচনও শুরাভিত্তিক পদ্ধতির গুরুত্ব বহন করে।
- **কুরআনের প্রমিতকরণ (توحيد المصاحف):** উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো কুরআনের বিভিন্ন পঠনরীতিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের বিস্তার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে কুরআনের পঠনরীতিতে কিছু পার্থক্য দেখা দেয়, যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারত। উসমান (রাঃ) এই আশঙ্কা উপলব্ধি করে যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং কুরআনের একটি প্রমিত অনুলিপি তৈরি করার নির্দেশ দেন, যা কুরাইশদের বিশুদ্ধ উচ্চারণে লিপিবদ্ধ ছিল। এই অনুলিপি 'মুসহাফে উসমানী' নামে পরিচিত এবং এর বহু প্রতিলিপি তৈরি করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিতরণ করা হয়। এর ফলে কুরআনের বিশুদ্ধতা ও অভিন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য দৃঢ় হয়।
- **সাম্রাজ্যের একত্রীকরণ ও সম্প্রসারণ (توسيع وتوحيد الدولة):** উসমান (রাঃ)-এর সময়েও ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। মুসলিম বাহিনী আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, খোরাসান এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু নতুন অঞ্চল জয় করে। তিনি নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করেন এবং ভূমধ্যসাগরে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু প্রশাসনিক দুর্বলতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে, যা পরবর্তীতে অসন্তোষের জন্ম দেয়।
- **কিছু বিতর্ক ও শাহাদাত (بعض الخلافات والشهادة):** উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ ছয় বছর কিছু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে। এই অসন্তোষ মিশর, কুফা ও বসরা থেকে আগত বিদ্রোহীদের মাধ্যমে চরম আকার ধারণ করে। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা মদীনায় প্রবেশ করে এবং উসমান (রাঃ)-কে তাঁর নিজ গৃহে অবরোধ করে নির্মমভাবে শহীদ করে।

তাঁর শাহাদাতের ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গভীর বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে প্রথম ফিতনার (গৃহযুদ্ধ) সূচনা করে।

৪. আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ) (৬৫৬-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা এবং নবী (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তাঁর খিলাফতকাল ছিল প্রায় পাঁচ বছর এবং এটি ছিল মুসলিম ইতিহাসের এক কঠিন ও সংঘাতপূর্ণ সময়।

- **খিলাফত লাভ (تولي الخلافة):** উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর মদীনার জনগণ আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ)-কে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করে। তবে, সিরিয়ার প্রভাবশালী গভর্নর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) উসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচার এবং আলীর (রাঃ) খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করেন, যার ফলে মুসলিমদের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক বিভেদ দেখা দেয়।
- **প্রথম ফিতনা (الفتنة الكبرى) - প্রথম গৃহযুদ্ধ:** আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুসলিমদের মধ্যে প্রথম বড় ধরনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এর মূল কারণ ছিল উসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচার এবং নেতৃত্বের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক।
    - **জঙ্গে জামাল (Battle of the Camel) - উটের যুদ্ধ (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ):** আয়েশা (রাঃ), তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী উসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচারের দাবিতে বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। আলীর (রাঃ) বাহিনী তাদের মোকাবেলা করে এবং বসরা প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আলী (রাঃ) বিজয়ী হন, তবে বহু সম্মানিত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এই যুদ্ধ মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের সূচনা করে।
    - **সিফফিনের যুদ্ধ (Battle of Siffin) (৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ):** আলী (রাঃ)-এর বাহিনী এবং মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বাহিনীর মধ্যে সিরিয়ার সিফফিন নামক স্থানে দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। মুয়াবিয়ার (রাঃ) পক্ষের আমর ইবনুল আসের (রাঃ) কূটকৌশলের ফলে উভয় পক্ষ সালিশের (তাহকিম) মাধ্যমে সমাধানের সিদ্ধান্ত নেয়।
    - **তাহকিম (Arbitration) - সালিশ:** সিফফিনের যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের সম্মতিতে একটি সালিশ পরিষদ গঠিত হয়, যাদের কাজ ছিল বিরোধের মীমাংসা করা। তবে এই সালিশের ফলাফল আলীর (রাঃ) কিছু সমর্থকের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, যারা মনে করত মুয়াবিয়ার (রাঃ) সাথে কোনো আপোষ করা উচিত নয়। এই গোষ্ঠী 'খারেজী' নামে পরিচিত হয় এবং তারা আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ) উভয়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
    - **নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (Battle of Nahrawan) (৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ):** আলী (রাঃ) খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন, তবে এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি বহু মূল্যবান সময় ও শক্তি হারান।
- **শাহাদাত (الشهادة):** দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধের পর ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে কুফার মসজিদে ফজরের নামাজের সময় খারেজী আব্দুর রহমান ইবনুল মুলজিমের হাতে আলী (রাঃ) শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং উমাইয়া খিলাফতের সূচনা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ইসলামী ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। এই যুগের খলীফাগণ নবী (সাঃ)-এর আদর্শকে অনুসরণ করে ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন এবং ইসলামের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেন। তাঁদের জীবন ও কর্ম মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন প্রেরণার উৎস। কামিল পরীক্ষার জন্য এই যুগের প্রতিটি খলীফার অবদান, তাঁদের শাসনকালের প্রধান ঘটনাবলী এবং এর তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-(الدولة الأموية (٦٦١-٧٥٠

❖ উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) - (الدولة الأموية (٦٦١-٧٥٠:

উমাইয়া খিলাফত, খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগের পর ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং প্রায় ৯০ বছর (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) স্থায়ী হয়। এই সময়কাল ইসলামী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ, যেখানে খিলাফত একটি বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। উমাইয়া খিলাফতের প্রতিটি দিক গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

১. উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক পর্যায়:

- **রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও প্রতিষ্ঠা (الخلفية السياسية والتأسيس):** হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর ইসলামী বিশ্বে গভীর রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ), যিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর আত্মীয় এবং দীর্ঘকাল ধরে সিরিয়ার অত্যন্ত ক্ষমতাধর গভর্নর ছিলেন, নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি হযরত আলীর (রাঃ) সাথে দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে এবং রক্তপাত এড়ানোর জন্য মুয়াবিয়ার (রাঃ) সাথে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রাঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ইসলামী শাসনের কেন্দ্র মদীনা থেকে দামেস্কে স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনা খোলাফায়ে রাশেদীনের শুরাভিত্তিক নির্বাচনের সমাপ্তি এবং উমাইয়া বংশের শাসনের সূচনা করে। দামেস্ক, যা পূর্বে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল, নতুন ইসলামিক সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- **সুফিয়ানি শাখার শাসন (حكم الفرع السفياني):** মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে শুরু করে তাঁর পুত্র ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া এবং পৌত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার স্বল্পকালীন শাসন (৬৬১-৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ) উমাইয়া খিলাফতের প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। মুয়াবিয়া (রাঃ) ছিলেন একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দক্ষ রাজনীতিবিদ। তিনি কূটনীতি এবং প্রশাসনিক দক্ষতার মাধ্যমে নবগঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে, ইয়াজিদের শাসনকালে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যেখানে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা শাহাদাত বরণ করেন। এই

ঘটনা মুসলিম বিশ্বে গভীর শোক ও ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং শিয়া মতবাদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার স্বল্পকালীন শাসনের পর উমাইয়া বংশের ক্ষমতা মারওয়ানি শাখায় স্থানান্তরিত হয়।

২. উমাইয়া খিলাফতের বিস্তার ও স্বর্ণযুগ:

- **মারওয়ানি শাখার উত্থান ও সাম্রাজ্য সুসংহতকরণ (صعود الفرع المرواني وتوحيد الإمبراطورية):** ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মারওয়ান ইবনুল হাকামের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের দ্বিতীয় ও দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় শুরু হয়। মারওয়ান এবং তাঁর উত্তরসূরীরা (আব্দুল মালিক, আল-ওয়ালিদ, সুলাইমান, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং হিশাম) দক্ষ প্রশাসক ও সমরনায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুল মালিকের শাসনকাল (৬৮৫-৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ) উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি একদিকে যেমন বিভিন্ন বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন, তেমনি অন্যদিকে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও মজবুত করেন।
- **অভূতপূর্ব সাম্রাজ্য বিস্তার (التوسع الإمبراطوري الهائل):** মারওয়ানি খলীফাদের সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের অভাবনীয় বিস্তার ঘটে। খলীফা আব্দুল মালিক এবং তাঁর পুত্র আল-ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনামল সামরিক বিজয়ের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শাসনের অধীনে আসে এবং ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে ভিসিগথিক স্পেন (আল-আন্দালুস) জয় করে। স্পেনের এই বিজয় ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। পূর্বে কুতাইবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মধ্য এশিয়ার ট্রান্সক্সানিয়া (বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান) অঞ্চলে সমরকন্দ, বুখারা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর জয় করে মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে। একই সময়ে সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তান) অঞ্চলের কিছু অংশও মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। উমাইয়া খিলাফতের এই ব্যাপক বিস্তার এটিকে ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত করে।

৩. উমাইয়া খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- **প্রশাসনিক সংস্কার (الإصلاحات الإدارية):** উমাইয়া খলীফাগণ বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার করেন। খলীফা আব্দুল মালিকের সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল আরবি ভাষাকে সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা। এর আগে বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রিক, ল্যাটিন ও ফার্সি ভাষা সরকারি কাজে ব্যবহৃত হতো। আরবিকে সরকারি ভাষা করায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে একতা আসে। তিনি সাম্রাজ্যব্যাপী অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেন এবং নিজস্ব ইসলামিক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (দিনার ও দিরহাম) প্রচলন করেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়ক হয়। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা হয় এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য যোগ্য গভর্নর নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক

দপ্তর (দিওয়ান) যেমন দিওয়ান আল- খারাজ (রাজস্ব দপ্তর), দিওয়ান আল-জুনদ (সামরিক দপ্তর) এবং দিওয়ান আর-রাসাইল (যোগাযোগ দপ্তর) স্থাপন করা হয়, যা সরকারি কাজকর্মকে সুশৃঙ্খল করে তোলে।

- **স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশ (تطور العمارة والفنون):** উমাইয়া খিলাফতের সময় ইসলামিক স্থাপত্য ও শিল্পকলার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। খলীফারা বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ, প্রাসাদ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করেন। দামেস্কের উমাইয়া গ্র্যান্ড মসজিদ (جامع بني أمية الكبير بدمشق) উমাইয়া স্থাপত্যের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যা পূর্বে একটি খ্রিস্টান ব্যাসিলিকা ছিল এবং এটিকে ইসলামিক স্থাপত্যশৈলীতে রূপান্তরিত করা হয়। জেরুজালেমের ডোম অফ দ্য রক (قبة الصخرة) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন, যা খলীফা আব্দুল মালিকের নির্দেশে নির্মিত হয় এবং এটি ইসলামিক স্থাপত্যের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। উমাইয়া শিল্পকলায় বাইজেন্টাইন ও সাসানীয় শিল্পকলার প্রভাব দেখা গেলেও এতে ইসলামিক অলংকরণ ও নকশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। মোজাইক, ফ্রেস্কো এবং ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার এই সময়ের স্থাপত্য ও শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- **সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানচর্চা (النشاط الثقافي والفكري):** উমাইয়া খলীফাগণ কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাজদরবারে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও কাব্যিক মজলিসের আয়োজন করা হতো। যদিও এই সময়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগের মতো ব্যাপকতা ছিল না, তবুও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদের প্রাথমিক কাজ এই যুগেই শুরু হয়। চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের কিছু মৌলিক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হতে থাকে। তবে, ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা ও হাদিস সংগ্রহের কাজ এই সময়ে তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল।

৪. উমাইয়া খিলাফতের দুর্বলতা ও পতনের কারণ:

- **আরব জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য ও মাওয়ালী অসন্তোষ (هيمنة العروبة وسخط الموالي):** উমাইয়া খলীফাগণ আরব মুসলিমদেরকে অ-আরব মুসলিমদের (মাওয়ালী) তুলনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দিতেন। মাওয়ালীরা, যারা সংখ্যায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ইসলামী সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো আচরণ পেত। তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নিয়োগে অনীহা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতো, যা তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দেয়। এই জাতিগত বৈষম্য উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিরোধী শক্তি তৈরি করে।
- **বংশানুক্রমিক শাসন ও শুরাভিত্তিক ঐতিহ্যের বিচ্যুতি (الحكم الوراثي والانحراف عن الشورى):** খোলাফায়ে রাশেদীনের শুরাভিত্তিক নির্বাচনের ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে উমাইয়ারা বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ইসলামের গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী ছিল বলে বহু মুসলিম মনে করতেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নীতির প্রবর্তন প্রায়শই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের জন্ম দিত, যা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকে দুর্বল করে তোলে।
- **শিয়া ও অন্যান্য বিরোধী গোষ্ঠীর বিদ্রোহ (ثورات الشيعة والجماعات المعارضة الأخرى):** কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর শিয়া মুসলিমদের মধ্যে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা

বিভিন্ন সময়ে উমাইয়া খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এছাড়াও, খারেজী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিরোধী গোষ্ঠী উমাইয়া শাসনের বিভিন্ন নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা করত এবং সুযোগ পেলেই বিদ্রোহে লিপ্ত হতো, যা সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করত।

- **অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দুর্বল নেতৃত্ব (الصراعات الداخلية والقيادة الضعيفة):** উমাইয়া রাজপরিবারের বিভিন্ন শাখা ও উপ-গোত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। শেষ দিকের কিছু খলীফার অযোগ্যতা, বিলাসী জীবনযাপন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে উদাসীনতা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকে আরও দুর্বল করে তোলে এবং জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- **আব্বাসীয় বিপ্লব (الثورة العباسية):** পারস্যের খোরাসান অঞ্চলে আব্বাসীয়দের নেতৃত্বে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আব্বাসীয়রা নিজেদেরকে নবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর হিসেবে দাবি করত এবং উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিত। আবু মুসলিম খোরাসানীর মতো দক্ষ নেতার অধীনে আব্বাসীয় বাহিনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একের পর এক decisive বিজয় লাভ করে। তারা মাওয়ালী এবং উমাইয়া শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট অন্যান্য গোষ্ঠীর ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।
- **পতন (السقوط):** ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বৃহত্তর জাব নদীর তীরে সংঘটিত এক নির্ণায়ক যুদ্ধে উমাইয়া খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান আব্বাসীয় বাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন ঘটে এবং আব্বাসীয় খিলাফতের উত্থান হয়, যার কেন্দ্র ছিল বাগদাদ। তবে, উমাইয়া বংশের একজন শাহজাদা আব্দুর রহমান আল-দাখিল পালিয়ে স্পেনে গিয়ে কর্ডোভার উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে কর্ডোভার খিলাফত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং দশম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে মুসলিম শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে টিকে ছিল।

উমাইয়া খিলাফত ইসলামী ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। এটি একদিকে যেমন ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটায় এবং প্রশাসনিক ও স্থাপত্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, তেমনি অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য এবং বংশানুক্রমিক শাসনের প্রবর্তনের কারণে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বিরোধিতার জন্ম দেয়, যা শেষ পর্যন্ত এর পতন ডেকে আনে।

○ আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)-(الدولة العباسية (৭৫০-১২৫০

❖ আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) - (الدولة العباسية (৭৫০-১২৫৮:

আব্বাসীয় খিলাফত, যা ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতনের আগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে টিকে ছিল, ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এক সুদীর্ঘ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আব্বাসীয়রা ছিলেন নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল

মুত্তালিবের বংশধর এবং তাদের উত্থান ইসলামী শাসনের গতিপথকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিটি পর্যায়, অবদান এবং পতনের কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা অত্যাবশ্যক।

১. আব্বাসীয় বিপ্লব ও খিলাফতের প্রতিষ্ঠা:

- **উমাইয়া শাসনের প্রেক্ষাপট ও অসন্তোষের কারণ (خلفية حكم بني أمية وأسباب السخط):** উমাইয়া খিলাফতের শেষদিকে বেশ কিছু কারণে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছিল। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো:
    - আরব জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য (هيمنة العروبة): উমাইয়া খলীফাগণ আরব মুসলিমদেরকে অ-আরব মুসলিমদের (মাওয়ালী) তুলনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা দিতেন। মাওয়ালীরা, যারা ইসলামের প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছিলেন, প্রায়শই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো আচরণ পেতেন।
    - বংশানুক্রমিক শাসন ও শুরাভিত্তিক ঐতিহ্যের বিচ্যুতি (الحكم الوراثي والانحراف عن مبدأ الشورى): খোলাফায়ে রাশেদীনের শুরাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে উমাইয়ারা বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতো।
    - ধর্মীয় অসন্তোষ (السخط الديني): উমাইয়া শাসকদের অনেকের জীবনযাপন ইসলামের সরল আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা শিয়া মুসলিমদের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম দেয়।
    - অর্থনৈতিক বৈষম্য (التفاوت الاقتصادي): সাম্রাজ্যের সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।
- **আব্বাসীয় আন্দোলনের উত্থান ও বিস্তার (ظهور ونمو الحركة العباسية):** এই পরিস্থিতিতে পারস্যের খোরাসান প্রদেশে আব্বাসীয়দের নেতৃত্বে একটি সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আব্বাস এবং পরবর্তীতে তার পুত্র ইব্রাহিম আল-ইমাম। আবু মুসলিম খোরাসানী ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক সংগঠক। আব্বাসীয়রা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উমাইয়া শাসনের দুর্বলতাগুলো কাজে লাগিয়ে জনগণের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। তারা "আল-রিদা মিন আলি মুহাম্মাদ" (মুহাম্মদের পরিবারের মনোনীত ব্যক্তি) এই স্লোগান ব্যবহার করে শিয়া ও অন্যান্য অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেন।
- **সামরিক বিজয় ও খিলাফতের প্রতিষ্ঠা (الانتصارات العسكرية وتأسيس الخلافة):** আব্বাসীয় বাহিনী আবু মুসলিম খোরাসানীর নেতৃত্বে একের পর এক উমাইয়া গভর্নরদের পরাজিত করে ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর জাব নদীর তীরে উমাইয়া খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সাথে আব্বাসীয়দের

এক নির্ণায়ক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উমাইয়ারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং মারওয়ান নিহত হন। এর মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে এবং আব্বাসীয়রা ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাফফাহ কুফায় আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম খলীফা হিসেবে বায়আত গ্রহণ করেন।

২. আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ (Early Abbasid Period):

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম শতাব্দী (৭৫০-৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ) সাধারণত এর স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে খলীফারা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও বাণিজ্যের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

- **খলীফা আল-মনসুর ও বাগদাদের প্রতিষ্ঠা (الخليفة المنصور وتأسيس بغداد):** দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৬৮২ সালে টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে "মাদিনাতুস সালাম" (শান্তির শহর) নামে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে বাগদাদ নামে পরিচিত হয়। কৌশলগত অবস্থান, উন্নত জলবায়ু এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে বাগদাদ খুব দ্রুত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীতে পরিণত হয়। এটি জ্ঞান, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে বিদ্বান, শিল্পী ও বণিকরা এখানে আগমন করেন।
- **খলীফা হারুনুর রশিদ ও তাঁর দরবার (الخليفة هارون الرشيد وبلاطه):** পঞ্চম আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ দরবার এবং জ্ঞান ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত। "আরব্য রজনী"র গল্পগুলোতে তাঁর শাসনকালের একটি কাল্পনিক চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর সময়ে বাগদাদের সমৃদ্ধি ও খ্যাতি চরম শিখরে পৌঁছেছিল। তিনি বিখ্যাত বিদ্বান ও কবিদেরকে তাঁর দরবারে আশ্রয় দিতেন এবং জ্ঞানচর্চার জন্য উদার হস্তে অর্থ সাহায্য করতেন।
- **খলীফা আল-মামুন ও বায়তুল হিকমাহ (الخليفة المأمون وبيت الحكمة):** সপ্তম আব্বাসীয় খলীফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন একজন অত্যন্ত বিদ্বান ও যুক্তিবাদী শাসক। তিনি বাগদাদে "বায়তুল হিকমাহ" (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক (প্লেটো, অ্যারিস্টটল), ভারতীয় (গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা) ও পারস্যের (সাহিত্য, দর্শন) বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। এই অনুবাদ কর্ম মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানার্জনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং পরবর্তীকালের

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করে। আল-মামুন নিজেও বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং মুতাজিলা দার্শনিক মতবাদকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

- **জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশ (الازدهار العلمي غير المسبوق):** আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল ও দর্শনের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
    - গণিত: আল-খাওয়ারিজমি বীজগণিতের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং "আল-জাবর ওয়া আল-মুকালাবালা" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি (০-৯) এবং দশমিক পদ্ধতির ব্যবহারকে জনপ্রিয় করেন।
    - জ্যোতির্বিদ্যা: মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উন্নতমানের মানমন্দির স্থাপন করেন এবং নক্ষত্রদের গতিবিধি ও গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেন। তারা টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা संबंधी ধারণা সংশোধন করেন।
    - চিকিৎসা: ইবনে সিনা (আভিসেন্না) "আল-কানুন ফি আত-তিব্ব" (The Canon of Medicine) রচনা করেন, যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান পাঠ্যপুস্তক ছিল। আল-রাজি (রাজেস) চিকিৎসা ও রসায়ন উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
    - রসায়ন: জাবির ইবনে হাইয়ান (গেবার) আধুনিক রসায়নের জনক হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও পদার্থের বর্ণনা দেন।
    - দর্শন: আল-কিন্দি, আল-ফারাবি ও ইবনে সিনা গ্রিক দর্শনের সাথে ইসলামিক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেন এবং নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।
- **শিল্প ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি (ازدهار الفنون والآداب):** আব্বাসীয় যুগে আরবি সাহিত্য, কবিতা ও গদ্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। নতুন নতুন সাহিত্যিক ধারা ও শৈলীর উদ্ভব ঘটে। বিখ্যাত কবিদের মধ্যে আবু নুওয়াস, আল-মুতানাব্বি ও আবুল আলা আল-মা'আরি উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের আবির্ভাব ঘটে। কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্প ও ধাতবশিল্পেও উন্নতমানের উৎপাদন দেখা যায়। ইসলামিক অলংকরণ ও নকশার এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই সময়ে বিকশিত হয়।
- **বাণিজ্য ও অর্থনীতির প্রসার (ازدهار التجارة والاقتصاد):** আব্বাসীয় খিলাফত ছিল একটি বিশাল বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পূর্ব (চীন, ভারত) ও পশ্চিমের (ইউরোপ, আফ্রিকা) মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। বাগদাদ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা হতো। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি এবং উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ও দুর্বলতার কারণ (Decline and Fall of the Abbasid Caliphate):

নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলোর উত্থান ঘটে।

- **তুর্কি দাস-সৈন্যদের প্রভাব বৃদ্ধি (تزايد نفوذ الجنود الأتراك المماليك):** নবম শতাব্দী থেকে আব্বাসীয় খলীফারা তুর্কি দাস-সৈন্যদের (মামলুক) নিয়োগ করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এই তুর্কি সৈন্যরা সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং খলীফাদের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। খলীফারা কার্যত তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা সীমিত হয়ে যায়।
- **আঞ্চলিক শক্তির উত্থান (ظهور القوى الإقليمية المستقلة):** সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে শক্তিশালী স্থানীয় মুসলিম রাজবংশগুলোর উত্থান ঘটে, যারা কার্যত স্বাধীনভাবে শাসন করত এবং বাগদাদের খলীফার কর্তৃত্বকে কেবল নামেমাত্র মানত। এদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে তাহিরী (খোরাসান), সাফফারী (সিস্তান), সামানী (ট্রান্সক্সানিয়া ও খোরাসান) এবং পশ্চিমাঞ্চলে হামদানী (সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া), তুলুনী ও ইখশিদী (মিশর) উল্লেখযোগ্য। স্পেনে উমাইয়াদের একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীতে খিলাফতে পরিণত হয়।
- **শিয়া ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (منافسة الخلافة الفاطمية الشيعية):** দশম শতাব্দীতে মিশরে শিয়া ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা আব্বাসীয় খিলাফতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ফাতেমীয়রা নিজেদেরকে হযরত আলীর (রাঃ) বংশধর হিসেবে দাবি করত এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের একটি বড় অংশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
- **বুয়িদদের নিয়ন্ত্রণ (سيطرة البويهيين):** দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিয়া বুয়িদ রাজবংশ পারস্য থেকে এসে বাগদাদ দখল করে এবং খলীফাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। খলীফারা কার্যত বুয়িদ শাসকদের হাতের পুতুলে পরিণত হন এবং তাদের কোনো কার্যকর ক্ষমতা ছিল না।
- **সেলজুক তুর্কিদের আগমন (وصول السلاجقة الأتراك):** একাদশ শতাব্দীতে সুন্নি সেলজুক তুর্কিরা বুয়িদদের হটিয়ে বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং খলীফাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেলজুক সুলতানরা খলীফাদের সম্মান রক্ষা করলেও রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।
- **ক্রুসেড (الحملات الصليبية):** একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ আব্বাসীয় খিলাফতের দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তোলে। ক্রুসেডাররা মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে নেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘাত মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্পদ ও জনশক্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়।

- **অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ (الصراعات الداخلية والثورات):** আব্বাসীয় খিলাফতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দেয়, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও দুর্বল করে ফেলে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী খলীফার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
- **মঙ্গোল আক্রমণ ও পতন (الغزو المغولي والسقوط):** ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের নেতৃত্বে মঙ্গোল বাহিনী মধ্য এশিয়া ও পারস্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস করে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হয়। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলরা বাগদাদ অবরোধ করে এবং শহরটি দখল করে নেয়। তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালায় এবং শেষ আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তাসিমকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে, যা ইসলামী বিশ্বের জন্য এক চরম বিপর্যয় ছিল।

৪. আব্বাসীয় খিলাফতের ঐতিহাসিক তাৎপর্য (الأهمية التاريخية للخلافة العباسية):

আব্বাসীয় খিলাফত ইসলামী ইতিহাসে এক স্বর্ণালী অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও শেষদিকে রাজনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, তবুও এই যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের অবদান বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

- **জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিকাশ (حفظ وتطوير العلوم):** আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রিক, ভারতীয় ও পারস্যের জ্ঞানকে আরবিতে অনুবাদ করে সংরক্ষণ করেন এবং নিজস্ব মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেন। তাদের অবদান পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে।
- **সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি (الازدهار الثقافي):** আব্বাসীয় যুগে ইসলামী সংস্কৃতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। আরবি ভাষা ও সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। বাগদাদ একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।
- **বিশ্ব সভ্যতায় অবদান (المساهمة في الحضارة العالمية):** আব্বাসীয় খিলাফতের মুসলিম বিজ্ঞানীরা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও দর্শনের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, তা বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। তাদের আবিষ্কার ও তত্ত্ব পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের পথ দেখিয়েছে।
- **ধর্মীয় ও আইনশাস্ত্রের বিকাশ (تطور العلوم الدينية والفقهية):** আব্বাসীয় যুগে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, হাদিস শাস্ত্র ও ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) এর ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ বিখ্যাত ফকিহ এই যুগেই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

যদিও ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের পতনের মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে, তবুও এর সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার মুসলিম বিশ্বে দীর্ঘকাল ধরে টিকে ছিল। মামলুক শাসকরা কায়রোতে একটি নামেমাত্র আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে, যা ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয়দের মিশর বিজয়ের আগ পর্যন্ত টিকে ছিল, তবে এর কোনো কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না।

(খ) তাফসীর ও মুফাসসিরগণ- ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (الدكتور محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون)

(খ) ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস (তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস)

- ১. التفسير والتأويل : تعريفهما وموضوعهما وغرضهما وفوائدهما

তাফসীর ও তা'বীল: উভয়ের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

❖ ১. التفسير والتأويل : تعريفهما وموضوعهما وغرضهما وفوائدهما

তাফসীর ও তা'বীল: উভয়ের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

ইসলামী জ্ঞানচর্চায় "তাফসীর" (تفسير) ও "তা'বীল" (تأويل) দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যা কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যার সাথে জড়িত। যদিও অনেক সময় এই দুটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, তবে আলেমগণের মধ্যে এদের সূক্ষ্ম পার্থক্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

ক. সংজ্ঞা (التعريف):

- তাফসীর (تفسير): আভিধানিক অর্থে কোনো অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বিষয়কে স্পষ্ট ও বোধগম্য করা, উন্মোচন করা বা ব্যাখ্যা করা। ইসলামী পরিভাষায়, কুরআনের শব্দ, বাক্য, আয়াত ও সুরার বাহ্যিক অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্পষ্ট করাকে তাফসীর বলে। মুফাসসিরগণ সাধারণত কুরআনের শব্দ, তাদের শাব্দিক অর্থ, ব্যাকরণ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শানে নুযুল (আয়াত নাযিলের কারণ) এবং পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তাফসীর প্রণয়ন করেন।
- তা'বীল (تأويل): আভিধানিক অর্থে প্রত্যাবর্তন করা, কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত অর্থ বা ফলাফল নির্ধারণ করা। ইসলামী পরিভাষায়, তা'বীল হলো কোনো আয়াতের বাহ্যিক অর্থের বাইরে গিয়ে গভীরতর বা

ভিন্ন কোনো অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা, যার স্বপক্ষে শরীয়তের কোনো দলীল (কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস) বিদ্যমান থাকে। তা'বীল সাধারণত ইলমে রাসিখ (জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় গভীর) আলেমগণ করে থাকেন এবং এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কিছু আলেমের মতে, তাফসীর হলো সুস্পষ্ট অর্থের ব্যাখ্যা এবং তা'বীল হলো সম্ভাব্য অর্থের মধ্য থেকে দলিলের ভিত্তিতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া।

খ. বিষয়বস্তু (الموضوع):

- তাফসীরের বিষয়বস্তু: কুরআনের প্রতিটি আয়াত, শব্দ, বাক্য, তাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল), পূর্ববর্তী আয়াত ও হাদীসের সাথে সম্পর্ক, ফিকহী মাসআলা-মাসায়িল এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী। মুফাসসিরগণ কুরআনের প্রতিটি অংশের অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন।
- তা'বিলের বিষয়বস্তু: কুরআনের সেইসব আয়াত যেখানে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে অথবা বাহ্যিক অর্থে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা দেখা যায়। মুজতাহিদ ইমাম ও ইলমে রাসিখ আলেমগণ শরীয়তের অন্যান্য দলিলের (যেমন: অন্য আয়াত, সহীহ হাদীস, ইজমা) আলোকে সেইসব আয়াতের সম্ভাব্য অর্থগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন এবং একটি বিশেষ অর্থকে প্রাধান্য দেন।

গ. উদ্দেশ্য (الغرض):

- তাফসীরের উদ্দেশ্য: কুরআনুল কারীমের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, এর বিধি-বিধান ও শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং অন্যদের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া। তাফসীরের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পরিচয়, তাঁর গুণাবলী, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ইতিহাস, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ এবং জীবন যাপনের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।
- তা'বিলের উদ্দেশ্য: কুরআনের আপাত অস্পষ্ট বা একাধিক অর্থবোধক আয়াতের সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা, শরীয়তের অন্যান্য দলিলের সাথে কুরআনের আয়াতের কোনো আপাত বিরোধ থাকলে তা নিরসন করা এবং গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে কুরআনের অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা। তা'বিলের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করা যায়।

ঘ. উপকারিতা (الفوائد):

- **তাফসীরের উপকারিতা:**
    - কুরআনের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা যায়।
    - আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়।
    - ইসলামের বিধি-বিধান ও শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
    - জীবন পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা লাভ করা যায়।
    - ঈমান ও আমলের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়।
    - কুরআনের সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা উপলব্ধি করা যায়।
    - ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যায়।

- **তা'বিলের উপকারিতা:**
    - কুরআনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করা যায়।
    - শরীয়তের বিভিন্ন দলিলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।
    - কুরআনের আপাত অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধকতা দূর করা যায়।
    - ইসলামী চিন্তাধারার প্রসার ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়।
    - সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে কুরআনের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয় (তবে তা শরীয়তের মূলনীতির আলোকে হতে হবে)।
    - ইলমে রাসিখ আলেমদের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, তাফসীর ও তা'বীল উভয়ই কুরআনুল কারীমের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য অপরিহার্য। তাফসীর বাহ্যিক অর্থ উন্মোচন করে এবং তা'বীল গভীরতর তাৎপর্য অনুধাবনে সাহায্য করে।

২. نشأة التفسير والتأويل وتطورهما.- তাফসীর ও তা'বীল-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" (التفسير والمفسرون) গ্রন্থ অনুযায়ী তাফসীর ও তা'বীল-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং মুফাসসিরগণের আলোচনা বিস্তারিতভাবে নিচে তুলে ধরা হলো:

তাফসীর ও তা'বীল-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

তাফসীর ও তা'বীল ইসলামী জ্ঞানকাণ্ডের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা কুরআনুল কারীমের বোধ ও মর্ম অনুধাবনে অপরিহার্য। এদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে।

ক. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ:

- তাফসীরের সূচনা: কুরআন নাযিলের শুরু থেকেই এর ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন কুরআনের প্রথম মুফাসসির। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের আয়াতগুলোর শাব্দিক অর্থ, প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করতেন।
- তা'বীল-এর প্রাথমিক পর্যায়: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যায় অনেক সময় কুরআনের গভীরতর তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত অর্থের উন্মোচন ঘটত, যা তা'বীল-এর প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে, এই যুগে তাফসীর ও তা'বীল স্বতন্ত্র পরিভাষা হিসেবে পরিচিত ছিল না। বরং নবীর (সাঃ) ব্যাখ্যাই ছিল উভয়ের উৎস।
- সাহাবায়ে কেরামের জিজ্ঞাসা: সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুরআনের কোনো আয়াত বুঝতে অসুবিধা হলে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তিনি তাদের সন্দেহ নিরসন করতেন।

খ. সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগ:

- তাফসীরের বিস্তার: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুরআনের ব্যাখ্যাদানের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, আব্দুল্লাহ

ইবনে মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রমুখ। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন।

- বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব: এই যুগে তাফসীরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। কেউ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিসের ওপর নির্ভর করতেন, কেউ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের (যেমন: তাওরাত ও ইঞ্জিল) ভাষ্যের সাহায্য নিতেন, আবার কেউ আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোকে কুরআনের অর্থ অনুধাবন করতেন।
- তা'বীল-এর ব্যবহার: সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তা'বীল শব্দটি তাফসীরের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কুরআনের কোনো আয়াতের একাধিক সম্ভাব্য অর্থ থাকলে, Context এবং অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।
- তাবেঈনদের অবদান: তাবেঈনগণ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে কুরআনের জ্ঞান লাভ করেন এবং তাফসীরের ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন। তাদের মধ্যে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, মুজাহিদ ইবনে জাবর, কাতাদা ইবনে দি'আমা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গ. তাফসীরের স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ:

- জ্ঞানের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা: হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে তাফসীর একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই সময়ে মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে কেরাম কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা সংকলন করতে শুরু করেন।
- বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি: এই যুগে তাফসীরের বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়। যেমন:
    - আছারভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالمأثور): এই ঘরানার মুফাসসিরগণ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ওপর নির্ভর করতেন। ইমাম তাবারীর "জামি'উল বায়ান আন তা'বীল আয়িল কুরআন" এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
    - রায়ভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالرأي): এই ঘরানার মুফাসসিরগণ কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে এবং আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। তবে, এর অর্থ এই নয় যে তারা হাদীসকে উপেক্ষা করতেন, বরং তারা নিজস্ব ইজতিহাদের প্রয়োগ করতেন।
    - সুফীভিত্তিক তাফসীর (التفسير الصوفي): এই ঘরানার মুফাসসিরগণ কুরআনের আধ্যাত্মিক ও বাতেনী অর্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন।
- তা'বীল-এর স্বতন্ত্র তাৎপর্য: এই সময়ে তা'বীল শব্দটি তাফসীর থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য লাভ করে। তাফসীর যেখানে আয়াতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থের ব্যাখ্যার ওপর জোর দেয়, সেখানে তা'বীল আয়াতের অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ ও তাৎপর্য উন্মোচনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়তের মূলনীতি ও ভাষাগত নিয়মকানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো।

ঘ. পরবর্তী যুগের মুফাসসিরগণ ও তাফসীরের ক্রমবিকাশ:

- বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন: পরবর্তীকালে তাফসীরের গ্রন্থে ফিকহী মাসায়েল, কালাম শাস্ত্রের আলোচনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোজিত হতে থাকে।
- বিশেষায়িত তাফসীর: বিভিন্ন বিশেষায়িত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন: আহকামুল কুরআন (ফিকহী আয়াতের ব্যাখ্যা), তাফসীরুল ইশারী (সুফীবাদের আলোকে ব্যাখ্যা) ইত্যাদি।
- আধুনিক যুগের তাফসীর: আধুনিক যুগে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এছাড়াও, বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হচ্ছে।

তাফসীর ও মুফাসসিরগণ:

ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের উল্লেখযোগ্য মুফাসসিরগণের আলোচনা করেছেন। তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো:

- সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ): আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (তারজমানুল কুরআন), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) প্রমুখ। তাদের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে রচিত।
- তাবেঈন: সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহঃ), কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহঃ), আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) প্রমুখ। তারা সাহাবাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তাফসীরের ধারাকে আগে নিয়ে যান।
- প্রাথমিক যুগের মুফাসসিরগণ:
    - মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহঃ): তাঁর "জামি'উল বায়ান আন তা'বীল আয়িল কুরআন" (তাফসীরে তাবারী) আছারভিত্তিক তাফসীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।
    - আবু ইসহাক আস-সা'লাবী (রহঃ): তাঁর "আল-কাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসীরিল কুরআন" একটি প্রাচীন ও মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ।
- মধ্যযুগের মুফাসসিরগণ:
    - আবু আলী আল-ফাদল ইবনে আল-হাসান আত-তাবরাসী (রহঃ): শিয়া সম্প্রদায়ের এই আলেমের "মাজমা'উল বায়ান লি-উলুমিল কুরআন" একটি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ।
    - আল্লামা জারুল্লাহ আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর আল-জামখশারী (রহঃ): মু'তাজিলা মতাদর্শের এই আলেমের "আল-কাশশাফ আন হাকায়েকিত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আকাবীল" ভাষাতাত্ত্বিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে একটি উচ্চমানের তাফসীর।

- ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহঃ): আশ'আরী মতাদর্শের এই আলেমের "মাফাতিহুল গায়েব" (তাফসীরে কাবীর) একটি encyclopedic তাফসীর, যেখানে বিভিন্ন দার্শনিক ও কালামিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।
- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বায়দাবী (রহঃ): তাঁর "আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল" একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান তাফসীর।
- ইবনু কাসীর (রহঃ): তাঁর "তাফসীরুল কুরআনিল আজীম" আছারভিত্তিক তাফসীরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

- পরবর্তী যুগের মুফাসসিরগণ: জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহঃ) ও জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী (রহঃ) রচিত "তাফসীরে জালালাইন" একটি বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত তাফসীর।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে প্রত্যেক যুগের মুফাসসিরগণের জীবন ও কর্ম, তাদের তাফসীরের বৈশিষ্ট্য, তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং তাদের মতাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ঘরানার তাফসীরের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন, যা তাফসীর শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক।

- ৩. التفسير في العهد النبوي وفي عهد الصحابة والتابعين ومنهجه- নবী যুগে, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীর এবং এর পদ্ধতি

নবী যুগে, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীর এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

নবী যুগে, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীর এবং এর পদ্ধতি

কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের যাত্রা শুরু হয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে। এরপর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেঈন (রহঃ) এই ধারাকে আগে নিয়ে যান। এই তিনটি যুগে তাফসীরের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ছিল।

ক. নবী যুগে তাফসীর (التفسير في العهد النبوي):

- তাফসীরের মূল উৎস: নবী (সাঃ)-এর যুগে তাফসীরের মূল উৎস ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। কুরআনের কোনো আয়াত অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হলে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করতেন।
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভূমিকা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন কুরআনের প্রথম ও প্রধান মুফাসসির। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থ, শানে নুযুল (আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট), মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আম (সাধারণ) ও খাস (বিশেষ) আয়াতের তাৎপর্য, নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) আয়াতের পরিচয় এবং আল্লাহ্র অভিপ্রায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতেন।
- তাফসীরের পদ্ধতি: নবী (সাঃ) প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে তাফসীর করতেন:
  - ওহীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা: অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা সরাসরি ওহীর মাধ্যমে আসত।

- নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা: কিছু আয়াতের মর্ম অনুধাবনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজস্ব জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহ্‌র দেওয়া ফাহ্‌ম (বোধশক্তি) ব্যবহার করতেন। তবে, তাঁর এই ইজতিহাদ সর্বদা ওহীর মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকত।

- সাহাবায়ে কেরামের জিজ্ঞাসা: সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুরআনের কোনো অংশ বুঝতে অসুবিধা হলে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অনেক আয়াতের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট হতো।
- তাফসীরের গুরুত্ব: নবী (সাঃ) তাফসীরের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন এবং সাহাবাদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি এর সঠিক ব্যাখ্যাও প্রদান করতেন। এর মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান সাহাবাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়।

খ. সাহাবা যুগে তাফসীর (التفسير في عهد الصحابة):

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানের উত্তরাধিকার: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাফসীরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারা নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অর্জিত জ্ঞান, কুরআনের গভীর উপলব্ধি এবং নিজেদের প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন।
- প্রধান মুফাসসির সাহাবী: সাহাবা যুগে বহু বিদ্বান সাহাবী মুফাসসির হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন:
  - খুলাফায়ে রাশেদীন: হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)।
  - আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ): তিনি কুফায় কুরআনের শিক্ষাকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর তাফসীর জ্ঞান সুবিদিত।
  - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ): তিনি "তারজমানুল কুরআন" (কুরআনের অনুবাদক) হিসেবে খ্যাত এবং তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।
  - উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ): তিনি কুরআনের একজন বিখ্যাত কারী ও বিদ্বান ছিলেন।
  - যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ): তিনি ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) ও কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।
  - এছাড়াও, আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীও তাফসীর চর্চায় অবদান রাখেন।
- তাফসীরের পদ্ধতি: সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাফসীরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন:
  - কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা (تفسير القرآن بالقرآن): কোনো আয়াতের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য অন্য কোনো আয়াতের সাহায্য নিতেন।
  - রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা (تفسير القرآن بالسنة): কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীসে পাওয়া গেলে তাঁরা সেটিকে গ্রহণ করতেন। কারণ হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন।

- পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সাহায্য (الرجوع إلى أهل الكتاب): ইসরাঈলী রিওয়ায়াত (বনী ইসরাঈলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত বর্ণনা) থেকে কিছু তথ্য গ্রহণ করতেন, তবে তা যাচাই-বাছাই করে এবং কুরআনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।
- আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান (الاعتماد على اللغة العربية): কুরআনের ভাষাগত মাধুর্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান ব্যবহার করে আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতেন।
- নিজস্ব ইজতিহাদ ও পরামর্শ (الاجتهاد والشورى): কোনো আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কুরআন বা হাদীসে না পাওয়া গেলে, তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে ইজতিহাদের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন।

- তাফসীরের বৈশিষ্ট্য: সাহাবা যুগের তাফসীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রতি গভীর আনুগত্য এবং কুরআনের মূল spirit অক্ষুণ্ণ রাখা। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তা ছিল মূলত উপলব্ধির ভিন্নতা, মৌলিক বিষয়ে কোনো বিরোধ ছিল না।

গ. তাবেঈনদের যুগে তাফসীর (التفسير في عهد التابعين):

- সাহাবাদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী: তাবেঈনগণ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের ছাত্র ও অনুসারী। তারা সাহাবাদের কাছ থেকে কুরআনের জ্ঞান লাভ করেন এবং তাফসীরের ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেন।
- প্রধান মুফাসসির তাবেঈ: তাবেঈনদের মধ্যে বহু বিখ্যাত মুফাসসিরের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:
    - মক্কা: মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহঃ), আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর তাফসীর জ্ঞানকে आगे নিয়ে যান।
    - মদীনা: সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহঃ), মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ)। তারা মদীনার বিদ্বান সাহাবাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।
    - কুফা: আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ), মাসরুক ইবনে আল-আজদা' (রহঃ), হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহঃ)। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের শিক্ষায় আলোকিত হন।
- তাফসীরের পদ্ধতি: তাবেঈনগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবাদের অনুসৃত পদ্ধতিকেই প্রধানত অনুসরণ করতেন। তবে, তাদের যুগে কিছু নতুন প্রবণতাও দেখা যায়:
    - সাহাবাদের বর্ণনার ওপর নির্ভরতা: তারা তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবাদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং সেগুলোকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করতেন।
    - ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ব্যাপকতা: তাবেঈনদের যুগে ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে, এর মধ্যে অনেক দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনাও অনুপ্রবেশ করে।

- রায় ও ইজতিহাদের প্রসার: সাহাবাদের তুলনায় তাবেঈনদের যুগে রায় ও ইজতিহাদের প্রয়োগ আরও বিস্তৃত হয়। কারণ অনেক নতুন মাসআলার উদ্ভব হয়, যার সুস্পষ্ট সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যেত না।
- বিভিন্ন ঘরানার উদ্ভব: বিভিন্ন অঞ্চলের তাবেঈনদের মধ্যে তাফসীরের স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি হতে শুরু করে, যা তাদের শিক্ষকদের (সাহাবাদের) মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটাত।

- তাফসীরের বৈশিষ্ট্য: তাবেঈন যুগের তাফসীরে সাহাবাদের জ্ঞানের গভীরতা ও বিশুদ্ধতা অনেকাংশে বজায় ছিল। তবে, ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের অনুপ্রবেশ এবং রায় ও ইজতিহাদের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে কিছু ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনা ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, নবী যুগে তাফসীরের ভিত্তি স্থাপিত হয় ওহী ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে। সাহাবা যুগে এই জ্ঞান বিস্তৃত হয় এবং কুরআনের মাধ্যমে কুরআন, হাদীসের মাধ্যমে কুরআন, আরবী ভাষা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাফসীরের পদ্ধতি বিকশিত হয়। তাবেঈনদের যুগে সাহাবাদের জ্ঞান অনুসরণের পাশাপাশি রায় ও ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং তাফসীরের বিভিন্ন আঞ্চলিক ঘরানার সৃষ্টি হয়। এই তিনটি যুগ ইসলামী জ্ঞানকাণ্ডে তাফসীর শাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপন করে।

৪. **مصادر التفسير في العهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين**.- নবী যুগ, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের উৎসসমূহ

নবী যুগ, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের প্রধান উৎসসমূহ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে কামিল পরীক্ষার উপযোগী করে বিস্তারিতভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো:

❖ নবী যুগ, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের উৎসসমূহ

কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের জন্য নবী (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেঈন (রহঃ) বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করতেন। এই উৎসগুলো জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে তাফসীরের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করত।

ক. নবী যুগে তাফসীরের উৎসসমূহ (مصادر التفسير في العهد النبوي):

নবী (সাঃ)-এর যুগে তাফসীরের প্রধান ও মৌলিক উৎস ছিল দুটি:

- ১. ওহী (الوحي):
  - কুরআনুল কারীম স্বয়ং ছিল তাফসীরের প্রধান উৎস। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা যখন অস্পষ্ট মনে হতো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমে (আয়াত নাযিল করে অথবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে) তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করতেন।

- অনেক আয়াতের শানে নুযুল (নাযিলের প্রেক্ষাপট), মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ, আম (সাধারণ) ও খাস (বিশেষ) আয়াতের তাৎপর্য এবং নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিত) আয়াতের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লাভ করতেন।

- ২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস ও সুন্নাহ (السنة النبوية):
  - রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী (হাদীস), কর্ম (সুন্নাহ) এবং মৌন সম্মতি (তাকরির) কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল।
  - আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কুরআনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কুরআনে অনেক বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রদান করেছেন। যেমন: সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্বের নিয়মকানুন ইত্যাদি।
  - কিছু আয়াতের গভীর তাৎপর্য এবং আল্লাহ্র অভিপ্রায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের মাধ্যমে স্পষ্ট করতেন, যা মূলত ওহীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খ. সাহাবা যুগে তাফসীরের উৎসসমূহ (مصادر التفسير في عهد الصحابة):

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাফসীরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উৎসসমূহের উপর নির্ভর করতেন:

- ১. কুরআনুল কারীম (القرآن الكريم):
  - তাঁরা কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন। কোনো আয়াতের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য একই বিষয়ের অন্য আয়াত অথবা বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো আয়াত থাকলে তাঁরা সেটির সাহায্য নিতেন।
- ২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস ও সুন্নাহ (السنة النبوية):
  - তাঁরা কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসে পেলে সেটিকে গ্রহণ করতেন এবং এর ভিত্তিতে তাফসীর করতেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশেই কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন।
- ৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান (معرفتهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشهودهم للتنزيل):
  - সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন এবং কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই কারণে তাঁরা অনেক আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি অবগত ছিলেন।
- ৪. আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান (علمهم باللغة العربية وأساليبها):
  - তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ আরবী ভাষার অধিকারী এবং তৎকালীন আরবী সাহিত্য ও বাগ্মিতার সাথে পরিচিত ছিলেন। এই জ্ঞান কুরআনের ভাষাগত মাধুর্য, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোকে আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে তাঁদের সাহায্য করত।
- ৫. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জ্ঞান (معرفتهم بأخبار أهل الكتاب):

- কিছু সাহাবী, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ, আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) থেকে ইসলাম গ্রহণকারী বিদ্বানদের কাছ থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থ (যেমন: তাওরাত ও ইঞ্জিল) সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছিলেন। তবে, তাঁরা এই তথ্য কুরআনের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই গ্রহণ করতেন এবং এটিকে তাফসীরের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতেন। ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হিসেবে পরিচিত এই ধরনের বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

- ৬. নিজস্ব ইজতিহাদ ও পরামর্শ (اجتهادهم ورأيهم المستند إلى الأصول):
  - যখন কোনো আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কুরআন, হাদীস বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যেত না, তখন তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি এবং শরীয়তের সাধারণ উদ্দেশ্যের আলোকে নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে ইজতিহাদের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা পারস্পরিক পরামর্শও করতেন।

গ. তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের উৎসসমূহ (مصادر التفسير في عهد التابعين):

তাবেঈন (রহঃ) তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রধানত সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত উৎসগুলোর উপর নির্ভর করতেন, তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি ও উৎসের ব্যবহারে ভিন্নতা দেখা যায়:

- ১. কুরআনুল কারীম (القرآن الكريم):
  - তাঁরা কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন।
- ২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস ও সুন্নাহ (السنة النبوية):
  - তাঁরা হাদীসকে তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং সাহাবাদের বর্ণিত হাদীসের উপর নির্ভর করতেন।
- ৩. সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা (أقوال الصحابة وتفسيراتهم):
  - তাবেঈনগণ সাহাবায়ে কেরামের তাফসীর ও ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং সেগুলোকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকার কারণে কুরআনের মর্ম বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।
- ৪. আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান (علم اللغة العربية وآدابها):
  - তাঁরা আরবী ভাষার ব্যাকরণ, শব্দার্থ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান ব্যবহার করে কুরআনের অর্থ অনুধাবন করতেন।
- ৫. ইসরাঈলী রিওয়ায়াত (الإسرائيليات):
  - তাবেঈনদের যুগে ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ব্যবহার সাহাবাদের যুগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। তবে, এর মধ্যে অনেক দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনাও অনুপ্রবেশ করে। এই সময়ে অনেক মুফাসসির যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই ধরনের বর্ণনা তাদের তাফসীরে উল্লেখ করেন।
- ৬. নিজস্ব ইজতিহাদ ও পরামর্শ (الاجتهاد والرأي):
  - সাহাবাদের তুলনায় তাবেঈনদের যুগে রায় ও ইজতিহাদের প্রয়োগ আরও বিস্তৃত হয়। কারণ মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় অনেক আয়াতের নতুন

ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, যার সুস্পষ্ট সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যেত না। তবে, তাদের ইজতিহাদ কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায়, নবী যুগে তাফসীরের প্রধান উৎস ছিল ওহী ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস। সাহাবা যুগে এই দুটি উৎসের পাশাপাশি তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আরবী ভাষার জ্ঞান, পূর্ববর্তী কিতাবের কিছু তথ্য এবং ইজতিহাদও তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো। তাবেঈনদের যুগে সাহাবাদের ব্যাখ্যা প্রধান ভিত্তি ছিল, তবে ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের ব্যাপকতা এবং নিজস্ব ইজতিহাদের প্রসারও লক্ষ্য করা যায়। এই উৎসসমূহ বিভিন্ন যুগে কুরআনের সঠিক ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫. مدارس التفسير في عهدي الصحابة والتابعين- সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের বিভিন্ন ধারা

সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের বিভিন্ন ধারা (مدارس التفسير في عهدي الصحابة والتابعين) সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

❖ সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের বিভিন্ন ধারা

সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্র ও পদ্ধতির উদ্ভব হয়। ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষকদের প্রভাব এবং নিজস্ব ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাফসীরের বিভিন্ন ধারা বা স্কুলের সৃষ্টি হয়। ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) এই যুগের প্রধান তাফসীর কেন্দ্র এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ক. সাহাবা যুগে তাফসীরের প্রধান কেন্দ্রসমূহ (مراكز التفسير في عهد الصحابة):

সাহাবা যুগে তাফসীরের প্রধান কেন্দ্রগুলো ছিল মূলত সেই স্থানগুলো যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী বসবাস করতেন এবং কুরআন শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। এর মধ্যে প্রধানতম কেন্দ্রগুলো হলো:

- **১. মদীনা মুনাওয়ারা (المدينة المنورة):**
  - এটি ছিল ইসলামের প্রথম রাজধানী এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবাসস্থল। এখানে বহু সংখ্যক প্রখ্যাত সাহাবী বসবাস করতেন এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন।
  - গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী মুফাসসির: উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রমুখ।
  - বৈশিষ্ট্য: মদীনার তাফসীর মূলত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস ও সুন্নাহর উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। এখানকার সাহাবীরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাওয়ায় তাদের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা বেশি পরিলক্ষিত হতো।
- **২. মক্কা মুকাররামা (مكة المكرمة):**
  - কুরআন নাযিলের স্থান হওয়ায় মক্কার গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। এখানেও বহু সাহাবী বসবাস করতেন এবং তাফসীর চর্চা করতেন।

- গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী মুফাসসির: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি "তারজমানুল কুরআন" নামে খ্যাত এবং তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তাঁর তাফসীর জ্ঞান বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।
- বৈশিষ্ট্য: মক্কার তাফসীর কুরআনের ভাষাগত দিক, শানে নুযুল এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের (ইসরাঈলী রিওয়ায়াত, তবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে) তথ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এই ধারার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

- **৩. কুফা (الكوفة):**
  - ইরাকের এই শহরটি জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে বহু সংখ্যক সাহাবী, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ছাত্ররা তাফসীর চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।
  - গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী মুফাসসির: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।
  - বৈশিষ্ট্য: কুফার তাফসীর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিজস্ব ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গিও এই ধারায় প্রভাব ফেলেছিল।
- **৪. বসরা (البصرة):**
  - বসরাও ইরাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্র ছিল এবং এখানেও অনেক সাহাবী তাফসীর চর্চায় অবদান রাখেন।
  - গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী মুফাসসির: আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)।
  - বৈশিষ্ট্য: বসরার তাফসীরে হাদীস ও সাহাবাদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি ভাষাগত বিশ্লেষণের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হতো।
- **৫. মিশর (مصر):**
  - মিশরও সাহাবাদের জ্ঞানচর্চার একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।
  - গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী মুফাসসির: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)।
  - বৈশিষ্ট্য: মিশরের তাফসীরে হাদীস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো।

খ. তাবেঈনদের যুগে তাফসীরের প্রধান ধারা ও কেন্দ্রসমূহ (مدارس التفسير في عهد التابعين):

তাবেঈনদের যুগে সাহাবাদের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলো আরও বিকশিত হয় এবং কিছু নতুন ধারার সৃষ্টি হয়, যা মূলত তাদের শিক্ষকদের (সাহাবাদের) শিক্ষা ও পদ্ধতির অনুসরণ করত। প্রধান ধারাগুলো হলো:

- **১. মক্কার তাফসীর ধারা (مدرسة مكة للتفسير):**
  - প্রতিষ্ঠাতা: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।
  - গুরুত্বপূর্ণ তাবেঈন: মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহঃ), আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)। তারা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর তাফসীর পদ্ধতিকে আগে নিয়ে যান।

- বৈশিষ্ট্য: এই ধারায় কুরআনের ভাষাগত বিশ্লেষণ, শানে নুযুল এবং ইসরাঈলী রিওয়ায়াতের (যাচাই-বাছাইয়ের পর) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। মুজাহিদ (রহঃ) তাঁর বিস্তারিত তাফসীরের জন্য বিখ্যাত।

- **২. মদীনার তাফসীর ধারা (مدرسة المدينة للتفسير):**
  - গুরুত্বপূর্ণ তাবেঈন: সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহঃ), মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ)। তারা মদীনার প্রখ্যাত সাহাবাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেন।
  - বৈশিষ্ট্য: এই ধারায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস ও সুন্নাহর উপর সর্বাধিক নির্ভরতা দেখা যায়। এখানকার তাবেঈনগণ সাহাবাদের বর্ণিত হাদীস ও ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।
- **৩. কুফার তাফসীর ধারা (مدرسة الكوفة للتفسير):**
  - প্রতিষ্ঠাতা: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।
  - গুরুত্বপূর্ণ তাবেঈন: আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ), মাসরুক ইবনে আল-আজদা' (রহঃ), হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহঃ)। তারা ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের ছাত্র ছিলেন।
  - বৈশিষ্ট্য: এই ধারায় হাদীস ও সাহাবাদের ব্যাখ্যার পাশাপাশি নিজস্ব ইজতিহাদের প্রয়োগও দেখা যায়। হাসান বসরী (রহঃ) তাঁর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য বিখ্যাত। কাতাদা (রহঃ)-এর তাফসীরও অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়।
- **৪. বসরার তাফসীর ধারা (مدرسة البصرة للتفسير):**
  - গুরুত্বপূর্ণ তাবেঈন: আবুল আলিয়া (রহঃ), রাবী ইবনে আনাস (রহঃ)।
  - বৈশিষ্ট্য: বসরার তাফসীর ধারায় ভাষাগত বিশ্লেষণ এবং কুরআনের অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হতো।
- **ধারাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব:**

যদিও এই কেন্দ্রগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান আদান-প্রদান এবং প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ছাত্ররা বিভিন্ন কেন্দ্রে ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং বিভিন্ন শিক্ষকের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হতেন। এর ফলে তাফসীরের জ্ঞান ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) এই ধারাগুলোর আলোচনায় তাদের প্রধান মুফাসসিরগণ, তাদের তাফসীরের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পদ্ধতির গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি ধারার প্রতিষ্ঠাতা সাহাবী, প্রধান তাবেঈন এবং তাদের তাফসীরের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

- ৬. أشهر المفسرين في الصحابة والتابعين تراجمهم.- সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী

ঠিক আছে, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- ❖ **সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী (أشهر المفسرين في الصحابة والتابعين تراجمهم)**

ক. সাহাবা যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ:

- **১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (عبد الله بن عباس رضي الله عنه):**
  - জীবনকাল: হিজরতের প্রায় ৩ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮ হিজরীতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের অন্যতম। তিনি "তারজমানুল কুরআন" (কুরআনের অনুবাদক) ও "হাবরুল উম্মাহ" (জাতির পণ্ডিত) উপাধিতে ভূষিত।
  - অবদান: কুরআনের গভীর জ্ঞান, শানে নুযুল সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মক্কায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাফসীর কেন্দ্র বহু শিক্ষার্থীর জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেছে।
- **২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه):**
  - জীবনকাল: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ৩২ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের একজন বড় আলেম হিসেবে পরিচিত।
  - অবদান: কুফায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাফসীর কেন্দ্র বহু জ্ঞান seekers-এর আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁর তাফসীরে হাদীস ও নিজস্ব ইজতিহাদের সংমিশ্রণ দেখা যায়।
- **৩. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) (أبي بن كعب رضي الله عنه):**
  - জীবনকাল: নবুওয়াতের প্রায় ২০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ অথবা ২০ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি আনসার সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম এবং কুরআনের বিখ্যাত কারী ও বিদ্বান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ পাঠকদের একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
  - অবদান: মদীনায় তিনি কুরআন শিক্ষা ও তাফসীর চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- **৪. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) (زيد بن ثابت رضي الله عنه):**
  - জীবনকাল: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের ১১ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্যতম কাতেব (লেখক) ছিলেন এবং কুরআন সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) ও কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।
  - অবদান: মদীনায় তিনি কুরআন ও ফারায়েজ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন।

- **৫. আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) (علي بن أبي طالب رضي الله عنه):**
  - জীবনকাল: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪০ হিজরীতে কুফায় শাহাদাত বরণ করেন।
  - পরিচিতি: তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা এবং চতুর্থ খলীফা। তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং বহু জটিল মাসআলার সমাধান দিতেন।
  - অবদান: কুরআনের গভীর জ্ঞান ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি অনেক আয়াতের তাৎপর্য স্পষ্ট করতেন।
- অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহাবী মুফাসসির: আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), উসমান ইবনে আফফান (রাঃ), আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ।

খ. তাবেঈন যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ:

- ১. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) (سعيد بن المسيب رحمه الله):
  - জীবনকাল: ১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি মদীনার বিখ্যাত তাবেঈ এবং ফিকহ ও হাদীসের একজন ইমাম হিসেবে সুপরিচিত।
  - অবদান: তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি সাহাবাদের বিশেষ করে উমর (রাঃ)-এর বক্তব্য ও হাদীসের উপর নির্ভর করতেন।
- ২. হাসান বসরী (রহঃ) (الحسن البصري رحمه الله):
  - জীবনকাল: ২১ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১০ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবেঈ, ওয়াকেফ (জ্ঞানবান), বাগ্মী ও আবেদ।
  - অবদান: তাঁর তাফসীরে গভীর আধ্যাত্মিক ও নীতি-নৈতিকতার আলোচনা স্থান পেত।
- ৩. মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহঃ) (مجاهد بن جبر رحمه الله):
  - জীবনকাল: ২১ হিজরীর দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৪ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বিখ্যাত ছাত্র এবং তাফসীর শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
  - অবদান: তাঁর বিস্তারিত তাফসীর অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি কুরআনের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন বলে বর্ণিত আছে।
- ৪. কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহঃ) (قتادة بن دعامة رحمه الله):
  - জীবনকাল: ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
  - পরিচিতি: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম ও মুফাসসির।
  - অবদান: তাঁর তাফসীর জ্ঞান বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। তিনি কুরআনের আয়াতগুলোকে হাদীস ও আরবী ভাষার আলোকে ব্যাখ্যা করতেন।
- ৫. আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) (عطاء بن أبي رباح رحمه الله):

  - জীবনকাল: ২৭ হিজরীর দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৪ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি ছিলেন মক্কার একজন বিখ্যাত আলেম ও ফকীহ।
  - অবদান: তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ও ব্যাখ্যা বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।
- অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তাবেঈ মুফাসসির: সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ), ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), রাবী ইবনে আনাস (রহঃ) প্রমুখ।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে এই বিখ্যাত মুফাসসিরগণের জীবন, শিক্ষা, অবদান এবং তাফসীরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই মুফাসসিরগণের নাম, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদান সম্পর্কে ধারণা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭. تاريخ تدوين التفسير.- তাফসীর লিপিবদ্ধ করার ইতিহাস

অবশ্যই, তাফসীর লিপিবদ্ধ করার ইতিহাস (تاريخ تدوين التفسير) সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

❖ তাফসীর লিপিবদ্ধ করার ইতিহাস

কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবনের জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু হলেও, তাফসীর একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ হতে বেশ সময় লেগেছে। এর কারণ হলো প্রাথমিক যুগে জ্ঞানের প্রধান মাধ্যম ছিল মুখস্থ করা ও শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা।

প্রাথমিক পর্যায়:

- নবী যুগে (العهد النبوي): রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন নাযিল হতো এবং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। এই ব্যাখ্যাগুলো মূলত মুখস্থ ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকত। কিছু সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে রাখলেও, তা ব্যাপকভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রচলন ছিল না।
- সাহাবা যুগে (عهد الصحابة): সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তাদের ব্যাখ্যাগুলোও মূলত স্মৃতি ও মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই শিষ্যদের কাছে পৌঁছাত। তবে, কিছু বিদ্বান সাহাবী ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে রাখতেন বলে কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিছু তাফসীর লিখেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই লেখাগুলো বিক্ষিপ্ত আকারে ছিল, কোনো সুসংগঠিত গ্রন্থের রূপ নেয়নি।
- তাবেঈনদের যুগে (عهد التابعين): তাবেঈনদের যুগে ইলমের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে অনেক তাবেঈন সাহাবাদের কাছ থেকে অর্জিত জ্ঞানকে একত্রিত ও লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তবে, এই যুগের লিপিবদ্ধ কাজগুলোও মূলত হাদীসের সংকলনের সাথে মিশ্রিত ছিল। তাফসীরের স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ তখনো পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয়নি।

তাফসীরের স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও লিপিবদ্ধকরণ:

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে তাফসীর একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং এর ব্যাপক লিপিবদ্ধকরণ শুরু হয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

- ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার: ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ ইসলামের সংস্পর্শে আসে। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।
- বিদ'আতের উদ্ভব: বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদ'আতের বিস্তার শুরু হলে, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেগুলোর মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- ইলমের সংরক্ষণ: মুখস্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা কমিয়ে জ্ঞানকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।

এই প্রেক্ষাপটে, মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে কেরাম হাদীসের পাশাপাশি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। তাফসীরের প্রাথমিক যুগের লিপিবদ্ধ কাজগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

- ১. হাদীস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাফসীর (التفسير ضمن كتب الحديث): এই যুগে তাফসীর স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে লিপিবদ্ধ না হয়ে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হতো। মুহাদ্দিসগণ তাদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে উল্লেখ করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের হাদীস গ্রন্থে তাফসীরের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।
- ২. স্বতন্ত্র তাফসীরের প্রাথমিক সংকলন (المصنفات الأولى في التفسير): এই সময়ে কিছু আলেম স্বতন্ত্রভাবে শুধু তাফসীরের উপর গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন। তবে, এই গ্রন্থগুলো সাধারণত আছারভিত্তিক ছিল, অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা সাহাবা ও তাবেঈনদের উক্তি ও বর্ণনার মাধ্যমে পেশ করা হতো। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাথমিক তাফসীর গ্রন্থের নাম ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায়, যদিও সেগুলো বর্তমানে পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায় না। যেমন:
    - তাফসীর ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (تفسير يحيى بن سلام): এটি দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ।
    - তাফসীর সুফিয়ান আস-সাওরী (تفسير سفيان الثوري): তিনিও এই যুগের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন।
    - তাফসীর ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (تفسير وكيع بن الجراح): তিনিও একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন এবং তাফসীর সংকলন করেছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থের আবির্ভাব:

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তাফসীর একটি স্বতন্ত্র ও সুসংগঠিত শাস্ত্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং এই সময়ে বহু বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়। এই যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী তাফসীর গ্রন্থ হলো:

- তাফসীর ইবনে জারীর আত-তাবারী (جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহঃ) (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) রচিত এই গ্রন্থটি আছারভিত্তিক তাফসীরের

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবা ও তাবেঈনদের বিভিন্ন উক্তি সনদসহ (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) উল্লেখ করেছেন এবং ভাষাগত ও ব্যাকরণগত দিক থেকেও আলোচনা করেছেন।

ইমাম তাবারীর (রহঃ) তাফসীর রচনার পর তাফসীর লিপিবদ্ধ করার ধারা আরও বেগবান হয় এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাফসীর গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। যেমন:

- আছারভিত্তিক তাফসীর: এই ধারায় সাহাবা ও তাবেঈনদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে তাফসীর লেখা হতো। ইবনু আবী হাতিম (রহঃ)-এর তাফসীর এই ধারার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- রায়ভিত্তিক তাফসীর: এই ধারায় কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে এবং আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও যুক্তির মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করা হতো। তবে, এই ধারায় মু'তাজিলা ও অন্যান্য বিতর্কিত ফেরকার প্রভাবও দেখা যায়।
- ভাষাতাত্ত্বিক তাফসীর: এই ধারায় কুরআনের ভাষাগত মাধুর্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। আল্লামা জামখশারী (রহঃ)-এর "আল-কাশশাফ" এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
- ফিকহী তাফসীর (আহকামুল কুরআন): এই ধারায় কুরআনের ফিকহ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এবং আহকাম ও মাসায়েল আলোচনা করা হতো। ইমাম জাসসাস (রহঃ)-এর "আহকামুল কুরআন" এই ধারার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- সুফীভিত্তিক তাফসীর (তাফসীরুল ইশারী): এই ধারায় কুরআনের আধ্যাত্মিক ও বাতেনী অর্থের উপর জোর দেওয়া হতো।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগে আরও বহু মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এই ধারা আজও অব্যাহত আছে। তবে, তাফসীর লিপিবদ্ধ করার প্রাথমিক ইতিহাস মূলত নবী, সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে জ্ঞানের মৌখিক প্রচার এবং হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে এর স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার মধ্যে নিহিত। ইমাম তাবারীর (রহঃ) "জামি'উল বায়ান" তাফসীর লিপিবদ্ধকরণের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

○ ৮. طبقات المفسرين ومراتب التفسير.- মুফাসসিরগণের স্তর ও তাফসীরের পর্যায়

আমার আগের উত্তরটি সম্ভবত আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী বিস্তারিত ছিল না। তাই, ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে মুফাসসিরগণের স্তর ও তাফসীরের পর্যায় আরও স্পষ্ট করে নিচে উপস্থাপন করছি:

মুফাসসিরগণের স্তর ও তাফসীরের পর্যায় (طبقات المفسرين ومراتب التفسير)

ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (রহঃ) তাফসীর শাস্ত্রের আলোচনায় মুফাসসিরগণের জ্ঞান, নির্ভরযোগ্যতা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিচারে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করেছেন। একইসাথে, কুরআনের ব্যাখ্যার পদ্ধতির ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন পর্যায়কেও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

ক. মুফাসসিরগণের স্তর (طبقات المفسرين):

আজ-জাহাবী (রহঃ) মুফাসসিরগণকে প্রধানত তিনটি মৌলিক স্তরে ভাগ করেছেন, যা পরবর্তীতে আরও উপ-স্তরে বিস্তৃত হয়েছে:

- **প্রথম স্তর: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (الطبقة الأولى: رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم):**
    - রাসূলুল্লাহ (সাঃ): তিনি ছিলেন কুরআনের প্রথম এবং সর্বোত্তম মুফাসসির। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল সরাসরি ওহীভিত্তিক, তাই তা সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত। কুরআনের কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তিনি সুস্পষ্ট সমাধান দিতেন।
    - সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ): তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন এবং কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন এবং তাফসীরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন:
        - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ): কুরআনের জ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত এবং তিনি "তারজমানুল কুরআন" উপাধিতে ভূষিত।
        - আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ): কুফার জ্ঞানকেন্দ্রে তাঁর তাফসীর শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
        - উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ): কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারী ও বিদ্বান হিসেবে পরিচিত।
        - যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ): কুরআন সংকলনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং তিনি ফারায়েজ ও কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।
        - আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ): জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত এবং কুরআনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ।
    - বৈশিষ্ট্য: এই স্তরের তাফসীর ছিল জ্ঞানের বিশুদ্ধতম উৎস, যেখানে সরাসরি ওহী এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও সাহাবাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ছিল।
- **দ্বিতীয় স্তর: তাবেঈন (الطبقة الثانية: التابعون رحمهم الله):**
    - তাবেঈনগণ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ছাত্র এবং তাঁদের কাছ থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রে (মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা) তাফসীর চর্চা করতেন এবং তাঁদের ব্যাখ্যা সাহাবাদের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হতো। এই স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাসসিরগণ হলেন:
        - মক্কা: মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহঃ), আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)।
        - মদীনা: সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহঃ), মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ)।

        - কুফা: হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদা ইবনে দি'আমা (রহঃ), আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ)।
    - বৈশিষ্ট্য: এই স্তরের তাফসীরে সাহাবাদের জ্ঞানের অনুসরণ এবং নিজস্ব ইজতিহাদের প্রাথমিক প্রয়োগ দেখা যায়। তবে, তাঁদের ব্যাখ্যায় সাহাবাদের বর্ণনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল।
- **তৃতীয় স্তর: পরবর্তী যুগের মুফাসসিরগণ (الطبقة الثالثة: من جاء بعد التابعين إلى يومنا هذا):**
    - তাবেঈনদের পরবর্তী যুগের সকল মুফাসসির এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানচর্চার বিস্তৃতি ও পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে এই স্তরকে আরও বিভিন্ন উপ-স্তরে ভাগ করা যায়:
        - আছারভিত্তিক মুফাসসিরগণ (أصحاب التفسير بالمأثور): যারা সাহাবা ও তাবেঈনদের বর্ণিত আছার (উক্তি ও বর্ণনা) সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে তাফসীর করেছেন। ইমাম তাবারী (রহঃ) এবং ইবনু কাসীর (রহঃ) এই ধারার প্রধান ব্যক্তিত্ব।
        - রায়ভিত্তিক মুফাসসিরগণ (أصحاب التفسير بالرأي المحمود): যারা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে এবং আরবী ভাষার জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাফসীর করেছেন।
        - বিভিন্ন মতাদর্শের মুফাসসিরগণ (أصحاب التفاسير الكلامية والفلسفية): যারা নিজ নিজ দার্শনিক ও কালামিক (তাত্ত্বিক) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন (যেমন: মু'তাজিলা, আশ'আরী)।
        - ভাষাতাত্ত্বিক মুফাসসিরগণ (أصحاب التفاسير اللغوية): যারা কুরআনের ভাষাগত মাধুর্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন (যেমন: জামখশারী)।
        - ফিকহী মুফাসসিরগণ (أصحاب تفاسير الأحكام): যারা কুরআনের আইন সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও আহকাম আলোচনা করেছেন (যেমন: জাসসাস)।
        - সুফী মুফাসসিরগণ (أصحاب التفاسير الصوفية): যারা কুরআনের আধ্যাত্মিক ও বাতেনী অর্থের উপর জোর দিয়েছেন।
        - আধুনিক যুগের মুফাসসিরগণ (مفسرو العصر الحديث): যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করছেন।

খ. তাফসীরের পর্যায় (مراتب التفسير):

আজ-জাহাবী (রহঃ) তাফসীরের ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমিক বিকাশকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন:

- **প্রথম পর্যায়: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা (مرحلة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم):**
    - এটি তাফসীরের প্রাথমিক ও ভিত্তি স্থাপনকারী পর্যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা ছিল ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং তা ছিল সকল প্রকার ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে।
- **দ্বিতীয় পর্যায়: সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা (مرحلة تفسير الصحابة رضوان الله عليهم):**
    - রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের ব্যাখ্যা তাফসীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

- **তৃতীয় পর্যায়: তাবেঈনদের ব্যাখ্যা (مرحلة تفسير التابعين رحمهم الله):**
  - তাবেঈনগণ সাহাবাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের ব্যাখ্যা সাহাবাদের ব্যাখ্যার অনুসারী হলেও, যুগের প্রয়োজনে নিজস্ব ইজতিহাদের প্রতিফলনও দেখা যায়।
- **চতুর্থ পর্যায়: আছারভিত্তিক তাফসীরের লিপিবদ্ধকরণ (مرحلة تدوين التفسير بالمأثور):**
  - এই পর্যায়ে সাহাবা ও তাবেঈনদের বর্ণিত তাফসীরগুলোকে হাদীস গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থে সনদসহ (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়। এর ফলে তাফসীরের জ্ঞান স্থায়ী রূপ লাভ করে।
- **পঞ্চম পর্যায়: রায়ভিত্তিক তাফসীরের বিস্তার (مرحلة ظهور التفسير بالرأي):**
  - জ্ঞানচর্চার প্রসার এবং বিভিন্ন মতাদর্শের উদ্ভব হওয়ায় এই পর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে যুক্তি ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তবে, কিছু ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ব্যাখ্যারও অনুপ্রবেশ ঘটে।
- **ষষ্ঠ পর্যায়: বিশেষায়িত তাফসীরের আত্মপ্রকাশ (مرحلة ظهور التفاسير المتخصصة):**
  - এই পর্যায়ে কুরআনের বিভিন্ন দিক (ভাষা, আইন, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি) নিয়ে স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়।
- **সপ্তম পর্যায়: আধুনিক যুগের তাফসীর (مرحلة التفسير في العصر الحديث):**
  - আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এই পর্যায়ে দেখা যায়। বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হচ্ছে।

আজ-জাহাবী (রহঃ) মুফাসসিরগণের স্তর ও তাফসীরের পর্যায় আলোচনার মাধ্যমে তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ এবং মুফাসসিরগণের জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতার একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। এই জ্ঞান তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস অনুধাবনে সহায়ক হবে।

৯. أشهر المفسرين من المتأخرين وتراجمهم ومناهجهم في المؤلفات التفسيرية- পরবর্তী যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী ও তাফসীর গ্রন্থাবলীতে তাঁদের পদ্ধতি

পরবর্তী যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী ও তাফসীর গ্রন্থাবলীতে তাঁদের পদ্ধতি (أشهر المفسرين من المتأخرين وتراجمهم ومناهجهم في المؤلفات التفسيرية) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

❖ পরবর্তী যুগের বিখ্যাত মুফাসসিরগণ: তাঁদের জীবনী ও তাফসীর গ্রন্থাবলীতে তাঁদের পদ্ধতি

এখানে আমি বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুফাসসির এবং তাঁদের তাফসীর গ্রন্থ ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব:

- **১. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ) (سيد قطب الشهيد رحمه الله):**
  - জীবনকাল: ১৯০৬ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালে শাহাদাত বরণ করেন।

- পরিচিতি: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও বিপ্লবী।
- তাফসীর: "ফী যিলালিল কুরআন" (في ظلال القرآن) - এটি তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ।
- পদ্ধতি:
  - আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের উপস্থাপন: তিনি আধুনিক যুগের মানুষের বোধগম্য ভাষায় কুরআনের মর্মার্থ তুলে ধরেছেন।
  - সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ: কুরআনের আয়াতগুলোর মাধ্যমে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর ইসলামী সমাধান অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।
  - ঈমান ও দাওয়াতের উপর জোর: ঈমানের গভীরতা ও ইসলামের দাওয়াতকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
  - সাহিত্যিক ও আবেগপূর্ণ ভাষা: তাঁর লেখার ভাষা অত্যন্ত সাহিত্যিক ও আবেগপূর্ণ, যা পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।
  - সার্বিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম: তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

- **২. আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) (أبو الأعلى المودودي رحمه الله):**
  - জীবনকাল: ১৯০৩ সালে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানে ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা।
  - তাফসীর: "তাফহীমুল কুরআন" (تفهيم القرآن) - এটি তাঁর সুবিস্তৃত ও প্রভাবশালী তাফসীর গ্রন্থ।
  - পদ্ধতি:
    - ইসলামের মৌলিক ধারণাগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা: তিনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মতো ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর যৌক্তিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
    - সমগ্র জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে আসার আহ্বান: তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন।
    - আধুনিক জ্ঞান ও যুক্তির ব্যবহার: আধুনিক জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে কুরআনের শিক্ষাগুলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।
    - ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি: তাঁর তাফসীর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
    - সিস্টেমিক আলোচনা: তিনি কুরআনের বিষয়বস্তুকে একটি সুসংগঠিত পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন।

- **৩. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী (রহঃ) (العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله):**
  - জীবনকাল: ১৯২৬ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২২ সালে কাতারে ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি ছিলেন সমকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ইসলামী আলেম ও চিন্তাবিদ।

- তাফসীর: তাঁর উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে "আত-তাফসীরুল ওয়াসীত লিল কুরআনিল কারীম" (التفسير الوسيط للقرآن الكريم)।
- পদ্ধতি:
  - মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য: তিনি ইসলামের মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছেন।
  - সমকালীন ফিকহী মাসায়েলের সমাধান: আধুনিক যুগের বিভিন্ন জটিল ফিকহী মাসায়েলের কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান প্রদানের চেষ্টা করেছেন।
  - সহজ ও সরল ভাষা: তাঁর লেখার ভাষা সহজ ও সরল, যা সাধারণ পাঠকের জন্য বোধগম্য।
  - উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির উপর গুরুত্ব: তিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
  - প্রাসঙ্গিক আলোচনা: তিনি সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের কুরআনভিত্তিক আলোচনা করেছেন।

- **৪. ডক্টর ওয়াহবা আয-যুহাইলী (রহঃ) (الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله):**
  - জীবনকাল: ১৯৩২ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালে ইন্তেকাল করেন।
  - পরিচিতি: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ ও আলেম।
  - তাফসীর: "আত-তাফসীরুল মুনীর ফিল আকীদাহ ওয়াশ শরী'আহ ওয়াল মানহাজ" (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج) - এটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ।
  - পদ্ধতি:
    - ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য: তাঁর তাফসীরে ফিকহী মাসায়েল ও শরীয়তের বিধানাবলীর উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।
    - আছার ও যুক্তির সমন্বয়: তিনি সাহাবা ও তাবেঈনদের আছার এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণের সমন্বয়ের মাধ্যমে তাফসীর করেছেন।
    - বিশদ আলোচনা: তিনি প্রতিটি আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেখানে ভাষাগত, ঐতিহাসিক ও শরীয়তের দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
    - বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ ও পর্যালোচনা: ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতামত উল্লেখ করে সেগুলোর পর্যালোচনা করেছেন।
    - সহজ ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা: জটিল বিষয়গুলোও তিনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

- **৫. আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানকীতী (রহঃ) (العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله):**
  - জীবনকাল: ১৮৯২ সালে মরিতানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে সৌদি আরবে ইন্তেকাল করেন।

- পরিচিতি: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম, ভাষাবিদ ও উসূলবিদ (ফিকহশাস্ত্রের নীতিমালা বিশেষজ্ঞ)।
- তাফসীর: "আদওয়াউল বায়ান ফী ঈজাহিল কুরআন বিল কুরআন" (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) - এটি তাঁর অনন্য তাফসীর গ্রন্থ।
- পদ্ধতি:
  - কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা: তাঁর তাফসীরের মূল বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা। তিনি প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আয়াত উল্লেখ করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেন।
  - ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও অর্থের উপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, যা তাঁর তাফসীরে প্রতিফলিত হয়।
  - উসূলুল ফিকহের জ্ঞান: ফিকহশাস্ত্রের নীতিমালার আলোকে তিনি অনেক আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।
  - সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা: তাঁর আলোচনা সাধারণত সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ ও গভীর।

এই মুফাসসিরগণ ছাড়াও আরও অনেকে পরবর্তী যুগে কুরআনের খেদমতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি কুরআনের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং আধুনিক মানুষের জন্য কুরআনকে অনুধাবন করা সহজতর হয়েছে। এই মুফাসসিরগণের জীবন, তাঁদের প্রধান তাফসীর গ্রন্থ এবং তাঁদের তাফসীরের মৌলিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

১০. أنواع التفسير (التفسير بالرواية والتفسير بالدراية) - তাফসীরের প্রকারভেদ (রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর ও জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর)

অবশ্যই, তাফসীরের প্রকারভেদ (রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর ও জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর) সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে উপযোগী বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

❖ তাফসীরের প্রকারভেদ (أنواع التفسير): রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর ও জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالرواية والتفسير بالدراية)

তাফসীরের মূল ভিত্তি ও উৎসের বিচারে একে প্রধানত দুটি broad categories-এ ভাগ করা যায়:

ক. রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالرواية) বা আছারভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالمأثور):

- শাব্দিক অর্থ: "রিওয়ায়াত" শব্দের অর্থ বর্ণনা করা বা উদ্ধৃত করা। সুতরাং, রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর হলো কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেঈন (রহঃ)) বর্ণনা ও উক্তির উপর নির্ভর করা। একে "আছারভিত্তিক তাফসীর"ও বলা হয়, যেখানে "আছার" অর্থ হলো পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া বাণী ও কর্ম।
- সংজ্ঞা: যে তাফসীরে কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং তাবেঈনদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত, তাকে রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর বলে। এই পদ্ধতিতে মুফাসসিরগণ নিজস্ব মতামত বা যুক্তির পরিবর্তে বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত আছারকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।
- **উৎসসমূহ: রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের প্রধান উৎসগুলো হলো:**
    - কুরআনুল কারীম: কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা।
    - সুন্নাহ (السنة النبوية): রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান।
    - আকওয়ালুস সাহাবা (أقوال الصحابة): সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) কুরআনের আয়াত সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও মতামত। এক্ষেত্রে সাহাবীদের ইজমা (ঐকমত্য) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
    - আকওয়ালুত তাবেঈন (أقوال التابعين): তাবেঈনদের (রহঃ) কুরআনের আয়াত সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও বক্তব্য। তবে, এটি সাহাবাদের মতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে অগ্রাধিকার পাবে না।
- **গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ: রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে:**
    - জামি'উল বায়ান আন তা'বীল আয়িল কুরআন (তাফসীরে তাবারী) - ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহঃ)। এটি এই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।
    - তাফসীরুল কুরআনিল আজীম - ইবনু কাসীর (রহঃ)। এটিও রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।
    - আল-দুররুল মানসুর ফিত তাফসীর বিল মা'সুর - জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহঃ)। এটি রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের একটি বৃহৎ সংকলন।
- **বৈশিষ্ট্য:**
    - ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সনদের উপর নির্ভরতা।
    - নিজস্ব মতামত ও যুক্তির ন্যূনতম ব্যবহার।
    - পূর্বসূরিদের ব্যাখ্যার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য।
    - কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।
- **কিছু সমালোচনা:**
    - কিছু রিওয়ায়াতের সনদ দুর্বল বা ভিত্তিহীন হতে পারে।
    - সকল আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বসূরিদের থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত নাও থাকতে পারে।

- যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু আয়াতের নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে, যা সরাসরি পূর্বসূরিদের বর্ণনায় নাও পাওয়া যেতে পারে।

খ. জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالدراية) বা রায়ভিত্তিক তাফসীর (التفسير بالرأي المحمود):

- শাব্দিক অর্থ: "দিরায়াত" শব্দের অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। সুতরাং, জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর হলো কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাষা, ব্যাকরণ, শরীয়তের মূলনীতি ও যুক্তির ব্যবহার করা। একে "রায়ভিত্তিক তাফসীর"ও বলা হয়, যেখানে "রায়" অর্থ হলো নিজস্ব জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা। তবে, এখানে "রায়" দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির বিরোধী স্বেচ্ছাচারী মতামত বোঝানো হয় না, বরং শরীয়তের কাঠামোর মধ্যে জ্ঞান ও যুক্তির প্রয়োগ বোঝানো হয়।
- সংজ্ঞা: যে তাফসীরে মুফাসসির কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান, শরীয়তের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাকে জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর বলে। তবে, এই পদ্ধতিতে মুফাসসিরের ব্যাখ্যা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বর্ণনার বিরোধী হতে পারবে না।
- **উৎসসমূহ: জ্ঞানভিত্তিক তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণ নিম্নলিখিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন:**
  - কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান: কুরআনের অন্যান্য আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের জ্ঞান।
  - আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান: শব্দের অর্থ, বাক্য গঠন, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।
  - শরীয়তের মূলনীতি ও সাধারণ উদ্দেশ্য (مقاصد الشريعة): ইসলামী শরীয়তের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান।
  - যুক্তি ও বিবেক (العقل): সঠিক যুক্তির প্রয়োগ এবং বিবেক দ্বারা আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন।
  - পূর্বসূরিদের ব্যাখ্যা: রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

- **গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ: জ্ঞানভিত্তিক তাফসীরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে:**
  - মাফাতিহুল গায়েব (তাফসীরে কাবীর) - ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহঃ)। এটি জ্ঞানভিত্তিক তাফসীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যেখানে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনাও স্থান পেয়েছে।
  - আল-কাশশাফ আন হাকায়েকিত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আকাবীল - আল্লামা জামখশারী (রহঃ)। এটি ভাষাতাত্ত্বিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে একটি উচ্চমানের তাফসীর।
  - আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল - আল-বায়দাবী (রহঃ)। এটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান জ্ঞানভিত্তিক তাফসীর।
  - আধুনিক যুগের অনেক তাফসীরও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:**

- কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে জ্ঞান ও যুক্তির প্রয়োগ।
- যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ।
- কুরআনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও হিকমত (প্রজ্ঞা) উন্মোচনে সহায়ক।
- ভাষাগত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব।

- **কিছু সমালোচনা:**
  - নিজস্ব মতামত ও প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
  - শরীয়তের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
  - অপব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, যদি মুফাসসিরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পর্যাপ্ত না হয়।

সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা:

অধিকাংশ বিদ্বান মনে করেন যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরের জন্য রিওয়ায়াত ও দিরায়াত (জ্ঞান) উভয়ের সমন্বয় জরুরি। বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান ও যুক্তির সঠিক প্রয়োগ কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে সহায়ক হতে পারে। একজন মুফাসসিরকে অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, আরবী ভাষা ও শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে এবং পূর্বসূরিদের ব্যাখ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তবে, যুগের চাহিদা ও নতুন প্রেক্ষাপটের আলোকে যৌক্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে উভয় প্রকার তাফসীরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করেছেন এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছেন, যেখানে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের পাশাপাশি জ্ঞান ও যুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

১১. أشهر التفاسير لأهل السنة وغيرهم من الشيعة والخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم- আহলে সুন্নাহ ও অন্যান্য যেমন শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা, ইবাদিয়া প্রমুখদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফিরকা যেমন শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা ও ইবাদিয়াদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ নিয়ে ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবীর (রহঃ) "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থের আলোকে আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

- **আহলে সুন্নাহ ও অন্যান্যদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ (أشهر التفاسير لأهل السنة وغيرهم من الشيعة والخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم)**

কুরআনের ব্যাখ্যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ইসলামিক গোষ্ঠী ও পণ্ডিতগণ করেছেন। তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস অনুসারে তাদের তাফসীরে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নিচে আহলে সুন্নাহ এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফিরকার বিখ্যাত তাফসীরগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

ক. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ:

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত হলো মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যারা কুরআন ও সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে মানে এবং সাহাবা ও তাবেঈনদের পথ অনুসরণ করে। তাদের রচিত বহু তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

- ১. জামি'উল বায়ান আন তা'বীল আয়িল কুরআন (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) - ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহঃ) (মৃত্যু ৩১০ হিজরী): এটি আছারভিত্তিক তাফসীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইমাম তাবারী (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে সাহাবা ও তাবেঈনদের উক্তি উল্লেখ করে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।
- ২. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম (تفسير القرآن العظيم) - ইবনু কাসীর (রহঃ) (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী): এটিও আছারভিত্তিক তাফসীরের একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। ইবনু কাসীর (রহঃ) হাদীস ও সাহাবাদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে বিস্তারিত তাফসীর করেছেন।
- ৩. আল-কাশশাফ আন হাকায়েকিত তানযীল ওয়া উয়ুনিল আকাবীল (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل) - আল্লামা জারুল্লাহ আবুল কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর আল-জামখশারী (রহঃ) (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী): যদিও জামখশারী (রহঃ) মু'তাযিলা মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন, তবে তাঁর এই তাফসীর ভাষাতাত্ত্বিক ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে অত্যন্ত উচ্চমানের এবং আহলে সুন্নাহর বিদ্বানদের মধ্যেও সমাদৃত। তবে, মু'তাযিলা প্রভাবিত অংশগুলো সমালোচিত হয়েছে।
- ৪. মাফাতিহুল গায়েব (مفاتيح الغيب) - ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহঃ) (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী): এটি "তাফসীরে কাবীর" নামেও পরিচিত। এটি একটি encyclopedic তাফসীর, যেখানে কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন দিক, দার্শনিক ও কালামিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।
- ৫. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) - আল-বায়দাবী (রহঃ) (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরী): এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান তাফসীর, যা এর ভাষাগত মাধুর্য ও গভীর ব্যাখ্যার জন্য বিখ্যাত।
- ৬. তাফসীরে জালালাইন (تفسير الجلالين) - জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহঃ) (মৃত্যু ৯১১ হিজরী) ও জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী (রহঃ) (মৃত্যু ৮৬৪ হিজরী): এটি একটি বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত তাফসীর।
- ৭. রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস সাব'উল মাছানী (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) - আল্লামা মাহমুদ আল-আলূসী (রহঃ) (মৃত্যু ১২৭০ হিজরী): এটি একটি বিস্তারিত ও ব্যাপকভিত্তিক তাফসীর, যেখানে পূর্ববর্তী তাফসীরগুলোর সারসংক্ষেপ ও লেখকের নিজস্ব মতামত স্থান পেয়েছে।

- ৮. ফী যিলালিল কুরআন (في ظلال القرآن) - সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ) (মৃত্যু ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ): এটি আধুনিক যুগের একটি প্রভাবশালী তাফসীর, যা সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলামের মর্মার্থ তুলে ধরে এবং ঈমান ও দাওয়াতের উপর জোর দেয়।
- ৯. তাফহীমুল কুরআন (تفهيم القرآن) - আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) (মৃত্যু ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ): এটিও আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর, যা ইসলামের মৌলিক ধারণাগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সমগ্র জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

খ. শিয়াদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ:

শিয়া ইসলামে আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশধরদের ইমাম হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। তাদের তাফসীরগুলোতে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য তাফসীর হলো:

- ১. মাজমা'উল বায়ান লি-উলুমিল কুরআন (مجمع البيان لعلوم القرآن) - আবু আলী আল-ফাদল ইবনে আল-হাসান আত-তাবরাসী (রহঃ) (মৃত্যু ৫৪৮ হিজরী): এটি শিয়াদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থ, যা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ও আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার) বর্ণনাকে গুরুত্ব দেয়।
- ২. আত-তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন (التبيان في تفسير القرآن) - শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আত-তুসী (রহঃ) (মৃত্যু ৪৬০ হিজরী): এটি শিয়াদের আরেকটি প্রভাবশালী তাফসীর গ্রন্থ, যা যুক্তি ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়।
- ৩. আল-মিজান ফী তাফসীরিল কুরআন (الميزان في تفسير القرآن) - আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন আত-তাবাতাবাঈ (রহঃ) (মৃত্যু ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ): এটি শিয়াদের আধুনিক যুগের একটি বিখ্যাত ও গভীর তাফসীর, যা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যার (التفسير بالقرآن بالقرآن) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করে।

গ. খারেজীদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ:

খারেজীগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি গোষ্ঠী, যারা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় তাঁর বিরোধিতা করেছিল। তাদের কিছু স্বতন্ত্র বিশ্বাস রয়েছে, তবে তাদের কোনো সুবিস্তৃত ও স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাদের মতামত বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

ঘ. মু'তাযিলাদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ:

মু'তাযিলা একটি যুক্তিবাদী ইসলামিক দার্শনিক গোষ্ঠী, যারা কুরআনের ব্যাখ্যায় যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনার উপর জোর দিতেন। তাদের উল্লেখযোগ্য তাফসীরগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তাফসীর আল-কাশশাফ (تفسير الكشاف) - আল্লামা জামখশারী (রহঃ) (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী): পূর্বে আহলে সুন্নাহর তাফসীরের আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মু'তাযিলা চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যেখানে যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

- অন্যান্য মু'তাযিলা বিদ্বানদের বিক্ষিপ্ত মতামত তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবে তাদের কোনো স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ খুব বেশি প্রসিদ্ধ নয়।

ঙ. ইবাদিয়াদের বিখ্যাত তাফসীরসমূহ:

ইবাদিয়া হলো খারেজীদের একটি শাখা, যারা তাদের কিছু চরমপন্থী মতামত থেকে সরে এসে মধ্যপন্থী অবস্থানে রয়েছে। তাদেরও কোনো ব্যাপকভাবে পরিচিত স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থ নেই। তাদের ধর্মীয় মতামত ও কুরআনের ব্যাখ্যা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়।

পর্যালোচনা:

বিভিন্ন ইসলামিক গোষ্ঠীর তাফসীর অধ্যয়ন করলে কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা যায়। আহলে সুন্নাহর তাফসীরগুলো সাধারণত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা-তাবেঈনদের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। অন্যদিকে, শিয়াদের তাফসীরে আহলে বাইতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। মু'তাযিলাদের তাফসীরে যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়, যদিও তা সমালোচিত হয়েছে। খারেজী ও ইবাদিয়াদের কোনো স্বতন্ত্র ও সুবিস্তৃত তাফসীর গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া না গেলেও, তাদের ধর্মীয় সাহিত্যে কুরআনের ব্যাখ্যার কিছু দিক পাওয়া যায়।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পদ্ধতির সমালোচনামূলক আলোচনা করেছেন, যা তাফসীর শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২. تاريخ التفسير بغير اللغة العربية (الفارسية والأردية والبنغالية) نشأته وتطوره- আরবি ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস (ফার্সি, উর্দু ও বাংলা): এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আরবি ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস (ফার্সি, উর্দু ও বাংলা): এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (تاريخ التفسير بغير اللغة العربية (الفارسية والأردية والبنغالية) نشأته وتطوره) একটি দীর্ঘ এবং বিস্তৃত আলোচনা। ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থে এই বিষয়ে সরাসরি

কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় আলোচনা না করলেও, সাধারণভাবে অনারব অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার এবং কুরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচে এই তিনটি ভাষায় তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

❖ **ফার্সি ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস (تاريخ التفسير بالفارسية):**

- উৎপত্তি: ফার্সি ভাষায় কুরআনের অনুবাদের ইতিহাস ইসলামের প্রাথমিক যুগেই শুরু হয়। অনারব মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই এর সূত্রপাত। তবে, প্রাথমিক অনুবাদগুলো সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ তাফসীর ছিল না, বরং আক্ষরিক অনুবাদ বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ছিল। পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচিত হতে আরও সময় লেগেছে।
- **ক্রমবিকাশ:**
    - প্রাথমিক অনুবাদ ও টীকা: দশম ও একাদশ শতাব্দীতে (চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী) ফার্সি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সময়ে কিছু আলেম কুরআনের আয়াতের নিচে ফার্সি ভাষায় টীকা বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখতেন।
    - পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থের আবির্ভাব: পরবর্তীকালে ফার্সি ভাষায় বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
        - কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার (كشف الأسرار وعدة الأبرار) - আবু-ল-ফজল রশিদ-উদ্দিন মেইবুদি (মৃত্যু ৫২০ হিজরী): এটি ফার্সি ভাষার অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত সুফী ঘরানার তাফসীর।
        - জাওয়াহিরুত তাফসীর লিল কুরআনিল কারীম (جواهر التفسير للقرآن الكريم) - হুসাইন ওয়াইজ কাশিফী (মৃত্যু ৯১০ হিজরী): এটি ফার্সি ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর।
        - এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে বহু ফার্সিভাষী আলেম কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর রচনা করেছেন।
- বৈশিষ্ট্য: ফার্সি ভাষায় রচিত তাফসীরগুলোতে প্রায়শই সুফীবাদের প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে প্রাচীন তাফসীরগুলোতে। এছাড়াও, ফার্সি সাহিত্য ও কাব্যিক ভাবনার প্রতিফলনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

❖ **উর্দু ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস (تاريخ التفسير بالأردية):**

- উৎপত্তি: ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সময় উর্দু ভাষার বিকাশ ঘটে। কুরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও, প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দুতে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।
- **ক্রমবিকাশ:**

- আক্ষরিক অনুবাদ: ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (রহঃ) কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উর্দু অনুবাদ করেন। এটি মূলত শব্দানুবাদ ছিল।
- তাফসীরের সূচনা: শাহ ইসমাইল শহীদ (রহঃ) "তাওযীহুল কুরআন" (توضيح القرآن) নামে একটি সংক্ষিপ্ত উর্দু তাফসীর রচনা করেন, যা কুরআনের মূল বার্তা তুলে ধরে।
- বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের আবির্ভাব: পরবর্তীকালে উর্দু ভাষায় বহু বিস্তারিত ও প্রভাবশালী তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
  - তাফহীমুল কুরআন (تفهيم القرآن) - আবুল আলা মওদুদী (রহঃ): এটি উর্দু ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর, যা আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করে।
  - মা'আরিফুল কুরআন (معارف القرآن) - মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ): এটি একটি বিস্তারিত ও জনপ্রিয় তাফসীর, যা আহলে সুন্নাহর ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে রচিত।
  - বায়ানুল কুরআন (بيان القرآن) - আশরাফ আলী থানভী (রহঃ): এটিও উর্দু ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর।

- বৈশিষ্ট্য: উর্দু তাফসীরগুলোতে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব দেখা যায়। আধুনিক যুগের তাফসীরগুলোতে সমকালীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামের দিকনির্দেশনা তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

❖ **বাংলা ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস (تاريخ التفسير بالبنغالية):**

- উৎপত্তি: বাংলা অঞ্চলে ইসলামের আগমন বহু শতাব্দী পূর্বে হলেও, বাংলা ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কাজ তুলনামূলকভাবে দেরিতে শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এর ব্যাপকতা লাভ করে।
- **ক্রমবিকাশ:**
  - প্রাথমিক অনুবাদ: গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই গিরিশচন্দ্র) ১৮৮৬ সালে কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ করেন। তবে, এটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়নি।
  - মুসলিম পণ্ডিতদের অনুবাদ: পরবর্তীতে বহু মুসলিম আলেম বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
    - মওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ (রহঃ): তাঁর অনুবাদ ও তাফসীর বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।
    - মাওলানা মনিরুদ্দীন ইউসুফ (রহঃ): তাঁর "কুরআনুল কারীম" সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদের জন্য পরিচিত।
    - অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (রহঃ): তাঁর অনুবাদও উল্লেখযোগ্য।
  - পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থের আবির্ভাব: বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর রচিত হয়েছে, যেমন:
    - তাফসীরে মারেফুল কুরআন (মাওলানা মুহম্মদ শফী (রহঃ) কর্তৃক উর্দুতে রচিত এবং পরে বাংলায় অনূদিত)। এটি একটি বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর।

- বিভিন্ন লেখকের খণ্ড খণ্ড তাফসীর এবং নির্বাচিত আয়াতের ব্যাখ্যাগ্রন্থও রয়েছে।

- বৈশিষ্ট্য: বাংলা তাফসীরগুলোতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব দেখা যায়। আধুনিক যুগের তাফসীরগুলোতে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে কুরআনের শিক্ষা তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সরল ও সহজ ভাষায় কুরআনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

❖ **সার্বিক প্রেক্ষাপট:**

আরবি ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় তাফসীরের ইতিহাস মূলত অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীর কুরআনের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষার ফল। সময়ের সাথে সাথে অনুবাদের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা স্থানীয় ভাষাভাষী মুসলিমদের জন্য কুরআনকে আরও বোধগম্য করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়া এখনো চলমান এবং বিভিন্ন ভাষায় নতুন নতুন তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ভাষাগত ভিন্নতার কারণে কুরআনের অর্থ অনুধাবনে যে সমস্যা হতে পারে এবং বিশুদ্ধ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন। যদিও তিনি বিশেষভাবে এই তিনটি ভাষার তাফসীরের ইতিহাস আলোচনা করেননি, তবে তাঁর আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে অনারব অঞ্চলে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে স্থানীয় ভাষায় কুরআনের ব্যাখ্যা ও অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ছিল।

১৩. علم أصول التفسير : تعريفه ونشأته وتطوره عبر العصور- ইলমে উসূলুত তাফসীর (তাফসীরের নীতিমালা): এর সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও শতাব্দীর পরিক্রমায় এর বিকাশ

ইলমে উসূলুত তাফসীর (علم أصول التفسير) : এর সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও শতাব্দীর পরিক্রমায় এর বিকাশ (تعريفه ونشأته وتطوره عبر العصور) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, যা তাফসীর শাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপন করে। ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিচে এর সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ তুলে ধরা হলো:

❖ ইলমে উসূলুত তাফসীর: সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ক. ইলমে উসূলুত তাফসীরের সংজ্ঞা (تعريف علم أصول التفسير):

"উসূল" (أصول) শব্দটি "আসল" (أصل)-এর বহুবচন, যার অর্থ ভিত্তি, মূলনীতি বা উৎস। "তাফসীর" (التفسير)-এর অর্থ হলো কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্ম উন্মোচন করা। সুতরাং, ইলমে উসূলুত তাফসীর হলো এমন একটি জ্ঞান শাখা যা কুরআনের ব্যাখ্যার মূলনীতি, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি এবং মুফাসসিরের যোগ্যতা ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে।

অন্যভাবে বলা যায়, ইলমে উসূলুত তাফসীর হলো সেই নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহের সমষ্টি যা একজন মুফাসসিরকে কুরআনের আয়াতের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করে এবং ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করে। এটি তাফসীর শাস্ত্রের একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী বিজ্ঞান।

খ. ইলমে উসূলুত তাফসীরের উৎপত্তি (نشأة علم أصول التفسير):

ইলমে উসূলুত তাফসীরের উৎপত্তি সরাসরি কুরআনের নাযিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যার সাথেই জড়িত। এর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ নিম্নরূপ:

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ: স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন কুরআনের প্রথম মুফাসসির এবং তিনিই কুরআনের ব্যাখ্যার মূলনীতি ও পদ্ধতি স্থাপন করেন। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল ওহীভিত্তিক এবং নির্ভুল। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা ও এর নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। যদিও এই যুগে "উসূলুত তাফসীর" নামে কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্রের উদ্ভব হয়নি, তবে এর বীজ প্রোথিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যাদান পদ্ধতিতেই।
- সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগ: সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন এবং তাদের মধ্যে যারা তাফসীরে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তারা কুরআনের ব্যাখ্যার কিছু মৌখিক নীতিমালা তৈরি করেছিলেন। তাবেঈনগণ সাহাবাদের কাছ থেকে এই নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং তাদের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেন। এই যুগেও "উসূলুত তাফসীর" স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি, তবে তাফসীরের মূলনীতিগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে।
- প্রাথমিক সংকলনের যুগ: হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে যখন হাদীস ও তাফসীর লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়, তখন মুহাদ্দিসীন ও উলামায়ে কেরাম কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইমাম তাবারী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বিশুদ্ধ সনদ ও পূর্বসূরিদের ব্যাখ্যার উপর জোর দেন, যা উসূলুত তাফসীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ: হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে ইলমে উসূলুত তাফসীর একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই সময়ে কিছু আলেম কুরআনের ব্যাখ্যার নীতিমালা ও পদ্ধতি নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

গ. শতাব্দীর পরিক্রমায় ইলমে উসূলুত তাফসীরের বিকাশ (تطوره عبر العصور):

ইলমে উসূলুত তাফসীরের বিকাশ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে:

- প্রথম পর্যায়: নীতিমালা প্রণয়নের সূচনা: এই পর্যায়ে কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য কিছু প্রাথমিক ও মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। মুফাসসিরগণ কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের উক্তি, আরবী ভাষা এবং যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।
- দ্বিতীয় পর্যায়: স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা: এই পর্যায়ে ইলমে উসূলুত তাফসীরের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে শুরু করে। এই গ্রন্থগুলোতে কুরআনের ব্যাখ্যার মূলনীতি, মুফাসসিরের যোগ্যতা, তাফসীরের প্রকারভেদ, অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা পদ্ধতি, নাসেখ-মানসুখ, আম-খাস, মুজমাল-মুফাসসাল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই যুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে:
    - আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন (البرهان في علوم القرآن) - বদরুদ্দীন আয-যারকাশী (রহঃ) (মৃত্যু ৭৯৪ হিজরী): যদিও এটি উলুমুল কুরআন (কুরআন সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞান শাখা) এর উপর রচিত, তবে এর মধ্যে তাফসীরের নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

- আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন (الإتقان في علوم القرآن) - জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রহঃ) (মৃত্যু ৯১১ হিজরী): এটিও উলুমুল কুরআনের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, যেখানে তাফসীরের নীতিমালা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিদ্যমান।

- তৃতীয় পর্যায়: নীতিমালাকে সুসংগঠিত ও বিস্তারিতকরণ: এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী নীতিমালাগুলোকে আরও সুসংগঠিত ও বিস্তারিত করা হয়। মুফাসসিরগণ তাফসীরের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন রিওয়ায়াতভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক তাফসীরের নিয়মাবলী, গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার মানদণ্ড ইত্যাদি নিয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করেন।
- চতুর্থ পর্যায়: আধুনিক যুগের অবদান: আধুনিক যুগে ইলমে উসূলুত তাফসীরের আলোচনা আরও বিস্তৃত হয়েছে। সমকালীন চিন্তাবিদ ও আলেমগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যার নীতিমালা নিয়ে নতুন করে ভাবছেন। কুরআনের ভাষাগত বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এর চিরন্তনGuidance আধুনিক মুফাসসিরদের আলোচনায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ভ্রান্ত ব্যাখ্যার খণ্ডন এবং সঠিক তাফসীরের মূলনীতি প্রতিষ্ঠায় আধুনিক আলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

গুরুত্ব:

ইলমে উসূলুত তাফসীর তাফসীর শাস্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ। এর জ্ঞান ছাড়া কুরআনের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়। এই নীতিমালা মুফাসসিরকে ব্যক্তিগত মতামত ও ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষা করে এবং কুরআনের মূল বার্তা অনুধাবনে সাহায্য করে। যুগের পরিক্রমায় ইলমে উসূলুত তাফসীরের বিকাশ কুরআনের জ্ঞানকে আরও সুসংহত ও বিজ্ঞানসম্মত করেছে।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ইলমে উসূলুত তাফসীরের গুরুত্ব এবং এর নীতিমালা অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিভিন্ন যুগের মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা পদ্ধতির আলোচনায় উসূলের অনুসরণ ও বিচ্যুতির উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যা এই শাস্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়ক।

১৪. ترجمة القرآن : تعريفه وأقسامه وحكمه و نشأته وتطوره- কুরআনের অনুবাদ: এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিধান এবং উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কুরআনের অনুবাদ: এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিধান এবং উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ترجمة القرآن: تعريفه وأقسامه وحكمه ونشأته وتطوره) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা কুরআনুল কারীমের বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ড. মুহাম্মদ হুসাইন আজ-জাহাবী (রহঃ) তাঁর "আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন" গ্রন্থে কুরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিচে এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিধান, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ তুলে ধরা হলো:

❖ কুরআনের অনুবাদ: সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিধান এবং উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ক. কুরআনের অনুবাদের সংজ্ঞা (تعريف ترجمة القرآن):

কুরআনের অনুবাদ বলতে আরবি ভাষার মূল কুরআনুল কারীমের অর্থকে অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে যারা আরবি ভাষা বোঝেন না, তারাও কুরআনের বার্তা ও শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

খ. কুরআনের অনুবাদের প্রকারভেদ (أقسام ترجمة القرآن):

কুরআনের অনুবাদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- ১. আক্ষরিক অনুবাদ (الترجمة الحرفية): এই প্রকার অনুবাদে কুরআনের প্রতিটি আরবি শব্দের আক্ষরিক অর্থ অন্য ভাষায় বসানো হয় এবং আরবি বাক্য গঠনের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়।
    - সমস্যা: আরবি ভাষার নিজস্ব বাগধারা, অলঙ্কারশাস্ত্র ও বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য ভাষায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করলে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ বোঝানো সম্ভব হয় না এবং অনুবাদ দুর্বোধ্য ও ব্যাকরণগতভাবে ভুল হতে পারে। কুরআনের ভাষাগত মাধুর্য ও অলঙ্কারও এতে অনুপস্থিত থাকে।
- ২. ভাবানুবাদ বা অর্থানুবাদ (الترجمة التفسيرية أو ترجمة المعنى): এই প্রকার অনুবাদে কুরআনের আয়াতের মূল ভাব, মর্ম ও অর্থকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু আক্ষরিক শব্দের অনুবাদ না করে আয়াতের সামগ্রিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।
    - বৈশিষ্ট্য: এই প্রকার অনুবাদ মূল অর্থের কাছাকাছি পৌঁছাতে সাহায্য করে এবং তা তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য হয়। তবে, অনুবাদকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা বোঝার ভুল প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। তাই, ভাবানুবাদ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য আলেমদের তত্ত্বাবধানে এবং তাফসীরের মূলনীতির আলোকে হওয়া উচিত।

গ. কুরআনের অনুবাদের বিধান (حكم ترجمة القرآن):

কুরআনের অনুবাদের বিধান নিয়ে আলেমদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে, তবে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মত হলো:

- আক্ষরিক অনুবাদ: বিশুদ্ধভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করা কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই, সাধারণভাবে শুধু আক্ষরিক অনুবাদের অনুমতি নেই, যতক্ষণ না এর সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বা টীকা যুক্ত করা হয়।

- ভাবানুবাদ বা অর্থানুবাদ: যারা আরবি ভাষা বোঝেন না, তাদের কাছে কুরআনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য আলেমদের তত্ত্বাবধানে ভাবানুবাদ করা জায়েজ। তবে, অনুবাদ অবশ্যই মূল অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং অনুবাদকের ব্যক্তিগত মতামত বা ভুল ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। প্রয়োজনে টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূল অর্থ স্পষ্ট করা উচিত।
- নামাজের ক্ষেত্রে: নামাজের মধ্যে কুরআনের আরবি ভাষাতেই তিলাওয়াত করা ফরজ (আবশ্যক)। অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ পাঠ করা জায়েজ নয়।

ঘ. কুরআনের অনুবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (نشأة ترجمة القرآن وتطوره):

কুরআনের অনুবাদের ইতিহাস ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু হয়, তবে এর পূর্ণাঙ্গ ও সুসংগঠিত রূপ পেতে সময় লেগেছে।

- প্রাথমিক পর্যায়: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন অনারব গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর সময় কুরআনের কিছু অংশের মৌখিক বা সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করা হতো বলে কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়।
- সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগ: অনারব অঞ্চলে ইসলামের বিস্তারের সাথে সাথে কুরআনের অর্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। কিছু সাহাবা ও তাবেঈন ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের কিছু অংশের ব্যাখ্যা তাদের স্থানীয় ভাষায় করতেন। তবে, এই সময়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ লিখিত অনুবাদের প্রমাণ পাওয়া যায় না।
- পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের সূচনা: কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত অনুবাদ কোন ভাষায় হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে, ফার্সি ভাষায় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে (চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী) পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়।
- বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ: এরপর বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বহু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
    - ফার্সি: দশম/একাদশ শতাব্দী থেকে বহু অনুবাদ হয়েছে।
    - লাতিন: দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের সময় কিছু অনুবাদ হয়েছিল, যা মূলত ভুল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।
    - উর্দু: ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বহু নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হয়েছে।
    - ইংরেজি: সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বহু অনুবাদ হয়েছে, যার মধ্যে কিছু প্রাচ্যবিদদের কাজ সমালোচিত হয়েছে।
    - ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কাজ শুরু হয়।
    - এছাড়াও, তুর্কি, মালয়, ইন্দোনেশিয়ান, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, রুশ, চীনা, জাপানি এবং অন্যান্য বহু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়েছে।
- আধুনিক যুগের অনুবাদ: আধুনিক যুগে কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে গুণগত মান ও নির্ভুলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় নির্ভরযোগ্য আলেমদের তত্ত্বাবধানে ভাবানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে মূল অর্থের স্পষ্টতা ও বোধগম্যতার উপর জোর দেওয়া হয় এবং ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা

হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন ইসলামিক সংস্থা ও প্রকাশনা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গুরুত্ব:

কুরআনের অনুবাদ বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ কুরআনের শিক্ষা, হিদায়াত ও আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারছে। তবে, অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, যাতে মূল অর্থের বিকৃতি না ঘটে। নির্ভরযোগ্য ও জ্ঞানসম্পন্ন আলেমদের দ্বারা প্রণীত ভাবানুবাদই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

ড. আজ-জাহাবী (রহঃ) কুরআনের অনুবাদের গুরুত্ব ও এর নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করে এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও সতর্কতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

কামিল (স্নাতকোত্তর তাফসীর প্রথম পর্ব পরীক্ষা-২০২৩

মডেল প্রশ্নপত্র

التاريخ الاسلامي وتاريخ علم التفسير

(আত-তারিখুল ইসলামি ও তারিখু ইলমিত তাফসির)

الورقة السادسة (৬ষ্ঠ পত্র)

বিষয় কোড: ৬২১১০৬

সময়: ৪ ঘন্টা **পূর্ণমান :১০০**

الملاحظة : أجب عن أربعة من مجموعة (ألف) وعن اثنين من مجموعة (ب) و عن أثنين من مجموعة (ج)

(ক অংশ হতে চারটি খ অংশ হতে দুটি গ অংশ হতে দুটি)

(أ) التاريخ الإسلامي- ٦٠

(ক. ইসলামী ইতিহাস)

١- أجب عن أربعة من الأسئلة التالية: ٦٠

(নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

أ- ما هي الايام الجاهلية؟ بين الاحوال الاجتماعية والدينية قبل ميلاد التي صلى الله عليه وسلم.

জাহেলিয়াতের যুগ কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর।

ب- اكتب اسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واهميتها في التاريخ الإسلامي

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের কারণসমূহ এবং ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব লিখ।

ج- ما معنى المعراج؟ وهل كان في المنام ام فى اليقظة بين عن الفضائل التي تحلى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج

মি'রাজ অর্থ কী? এটি কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগরণে? মি'রাজের রাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন তা বর্ণনা কর।

د- عرف ميثاق المدينة. ثم بين اهميته في التاريخ الإسلامي

মদীনার সনদ (মীসাকুল মদীনা)-এর সংজ্ঞা দিন। অতঃপর ইসলামী ইতিহাসে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(ب) تاريخ علم التفسير- ٤٠

(খ. ইলমুত তাফসীরের ইতিহাস)

٢- أجب عن اثنين من الاسئلة التالية مفصلا ٣٠

(নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে যেকোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে দাও)

أ. ما معنى التفسير وما الفرق بين التفسير والتأويل؟ وما المراد بالتفسير بالماثورة بين مفصلا

তাফসীর অর্থ কী? তাফসীর ও তা'বীল-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এবং তাফসীর বিল মাছূর (বর্ণনানির্ভর তাফসীর) বলতে কী বোঝায়? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

ب. ما العلوم التي يحتاج اليها المفسر في تفسير القرآن بين مفصلا

কুরআন তাফসীরের জন্য একজন মুফাসসিরের (ভাষ্যকারের) কী কী জ্ঞানের শাখা প্রয়োজন? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

ج. على وكيف بدأ تدوين التفسير؟ اكتب مفصلا

কখন এবং কিভাবে তাফসীর লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছিল? বিস্তারিতভাবে লিখ।

د. من الذين اشتهروا في التفسير من الصحابة ؟ بين مزايا التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারা তাফসীরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

مجموعة (ج)- ١٠

٣- علق على اثنين من الموضوعات التالية: ١٠

(নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে যেকোনো দু'টির উপর টীকা লিখ।)

أ. ما الفرق بين التفسير والترجمة؟ بين.

তাফসীর ও তরজমার (অনুবাদ) মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর।

ب. من هو رئيس المفسرين؟ اذكر خدماته في التفسير.

প্রধান মুফাসসির কে? তাফসীরের ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখ কর।

ج. اكتب أهمية التفسير في الحياة الانسانية.

মানব জীবনে তাফসীরের গুরুত্ব লিখ।

د. اكتب خصائص تفسير القرآن العظيم.

তাফসীরুল কুরআনিল আযীমের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।